আমার জীবন

হেলেন কেলার

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
অনূদিত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—দুই টাকা—

Bengali Translation of
The Story of My Life.
By
Helen Keller.

*

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও পরিচয় প্রেস ৮বি, দীনবন্ধু লেন হইতে শ্রীকৃষ্ণভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হেলেন কেলার র‍্যাডক্লিফ কলেজ থেকে "প্রশংসার সঙ্গে" বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তিনি এই আত্মজীবনী রচনা করেন। ঐ বৎসরই The Ladies Home Journal নামক পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কোন কোন সংস্করণে রচনার কোন কোন অংশ ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থ রচনায় হেলেন কেলার র‍্যাডক্লিফ কলেজের ইংরাজির শিক্ষক চার্লস্ টাউনসেণ্ড কোপল্যাণ্ড ও খ্যাতনামা সাহিত্য-সমালোচক জন এ্যালবার্ট মেসি-র কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পান। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর জীবনের প্রথম তেইশ বৎসরের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের বিস্তারিত বিবরণ জানবার কৌতূহল যাঁদের আছে তাঁরা যেন তাঁর রচিত Midstream, My Later Life (১৯২৯) ও Helen Keller's Journal (1938) গ্রন্থ দুখানি পাঠ করেন।

এক

একটু ভয়ে ভয়েই আমি আমার এই জীবন-কাহিনী লিখতে শুরু করছি। সোনালি কুয়াশার মত একটা ওড়নার আবরণে আমার শৈশব-জীবন আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। সেই আবরণ উন্মোচন করতে কেমন একটা অযৌক্তিক সংকোচ অনুভব করছি। আত্মজীবনী রচনা করা বেশ শক্ত কাজ। জীবনের প্রথমতম অনুভূতিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যে বছরগুলি বর্তমান ও অতীতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে রয়েছে তাদের এপার থেকে চেয়ে দেখলে ওপারের সত্য ও কল্পনার মধ্যে কোন পার্থক্যই বুঝতে পারা যায় না। বর্তমানের নারী অতীতের শিশুর অভিজ্ঞতাগুলিকে "আপন মনের মাধুরী" মিশিয়ে রঙীন করে তুলছে। আমার জীবনের প্রথম কয়েক বছরের স্মৃতিগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে, কিন্তু আর সব কথা "কারাগৃহের অন্ধকার ছায়ার মধ্যে' অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া শৈশবের অনেক সুখদুঃখ তাদের তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছে ; প্রথম জীবনের শিক্ষাসংক্রান্ত অনেকগুলি

অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পরবর্তী কালের বড় বড় আবিষ্কারের উত্তেজনার মধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। সুতরাং কাহিনী যাতে ক্লান্তিকর না হয়ে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে আমি পর পর কতকগুলি রেখাচিত্র এঁকে যাবার চেষ্টা করবো। যে সব পরম্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনা আমার নিজের কাছে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় মাত্র সেইগুলিই আমি এইভাবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করবো।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে উত্তর আলাবামার অন্তর্বর্তী টাস্কাম্বিয়া নামক ছোট্ট একটি সহরে আমার জন্ম হয়।

আমার বাবার দিক দিয়ে আমাদের বংশের আদি পুরুষ হলেন ক্যাস্পার কেলার নামক একজন সুইট্জারল্যাণ্ডের অধিবাসি। ইনি আমেরিকায় এসে মেরিল্যাণ্ডে বসতিস্থাপন করেন। আমার সুইট্জারল্যাণ্ডবাসী পূর্ব-পুরুষদের একজন জুরিখ নগরীতে বধির ছাত্রছাত্রীদের প্রথম শিক্ষকের কাজ করেছিলেন এবং তাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে একখানা বইও লিখে-ছিলেন—এটা একটা বিচিত্র কাকতালীয় ব্যাপার! অবশ্য একথাও সত্য যে, এমন কোন রাজা নেই যাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ না কেউ ক্রীতদাস ছিল না, এবং এমন কোন ক্রীতদাসও নেই যার পূর্বপুরুষের মধ্যে একজন রাজা ছিল না।

এই ক্যাস্পার কেলারের পুত্র আমার পিতামহ। ইনি আলাবামায় এসে একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে বসেন এবং অবশেষে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। আমি শুনেছি যে, খামারের প্রয়োজনীয় মালপত্র খরিদ করবার জন্য তিনি প্রতি বৎসর একবার করে ঘোড়ায় চড়ে টাস্কাম্বিয়া থেকে ফিলাডেলফিয়ায় যেতেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কাছে লেখা তাঁর অনেকগুলি চিঠি আমার এক পিসীমার কাছে আছে। এই চিঠিগুলিতে তাঁর এই সব ভ্রমণের অতি চমৎকার ও জীবন্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

আমার পিতামহী ছিলেন আলেকজাণ্ডার মুর নামক লাফায়েৎ-এর জনৈক সহকারীর কন্যা এবং আলেকজাণ্ডার স্পট্‌স্‌উড নামক ভার্জিনিয়ার জনৈক পুরাতন রাজকীয় শাসনকর্তার দৌহিত্রী। দূর সম্পর্কে তিনি বিখ্যাত সেনানায়ক রবার্ট ই. লীর খুড়তুত বোনও ছিলেন।

আমার বাবার নাম আর্থার এইচ কেলার। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় তিনি দক্ষিণী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। আমার মা কেট অ্যাডাম্‌স্‌ তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। আমার মায়ের পিতামহ বেঞ্জামিন অ্যাডামস্‌ সুসানা ই গুডহিউকে বিবাহ করেন এবং বহু বৎসর ম্যাসাচুসেট্‌সের মধ্যে নিউবেরি নামক স্থানে বাস করেন। তাঁদের পুত্র চার্লস্‌ অ্যাডামসের জন্ম হয় ম্যাসাচুসেট্‌সের নিউবেরিপোর্টে। তিনি দেশ ত্যাগ করে আরাকানসাসের অন্তর্ভুক্ত হেলেনা নামক স্থানে গিয়ে বাস করেন। যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি দক্ষিণীদের হয়ে যুদ্ধ করেন এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদ লাভ করেন। ইনি লুসী হেলেন এভারেটকে বিবাহ করেন। এডওয়ার্ড এভারেট ও ডাঃ এডওয়ার্ড এভারেট হেল যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন লুসী সেই পরিবারেরই মেয়ে। যুদ্ধ শেষ হলে পর এঁদের পরিবার টেনেসি-র অন্তর্ভুক্ত মেমফিস নগরে গিয়ে বাস করেন।

যে অসুখের ফলে আমার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায় সেই অসুখ হবার আগে পর্যন্ত আমি একটি ছোট্ট বাড়ীতে বাস করতাম। এতে ছিল একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ কক্ষ ও একটি ক্ষুদ্রতর কক্ষ। এই দ্বিতীয় কক্ষটিতে আমাদের চাকর রাত্রে ঘুমোত। বাসগৃহের কাছাকাছি একটি ছোট বাড়ী তৈরী ক'রে রাখা দক্ষিণাঞ্চলের প্রচলিত প্রথা। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বাসস্থান হিসাবে এটিকে ব্যবহার করা হত। গৃহযুদ্ধের পর আমার বাবা এই রকম একটা বাড়ী গড়েছিলেন। আমার মাকে বিয়ে করার পর তিনি সেখানে গিয়ে

বাস করতে থাকেন। বাড়ীটি দ্রাক্ষালতা, লতানে গোলাপ ও হনিসক্‌ল্‌ দিয়ে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সমাচ্ছন্ন ছিল। বাইরের বাগান থেকে চেয়ে দেখলে লতাকুঞ্জের মত দেখাতো। ছোট্ট গাড়ীবারান্দাটি পীত গোলাপ ও সাদার্ণ সিমিল্যাক্সের পর্দা দিয়ে আড়াল করা ছিল। ক্ষুদ্রকায় হামিংবার্ড পাখি ও মৌমাছির দল এখানে এসে ভিড় জমাতে ভালোবাসতো।

আমাদের এই ছোট্ট গোলাপকুঞ্জ থেকে কয়েক পা দূরেই ছিল কেলার-দের বাসভবন। পরিবারের আর সবাই এখানে বাস করতেন। এই গৃহের নাম ছিল "আইভি গ্রীণ," কারণ গৃহটি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গাছপালা ও বেড়াগুলি সব সুন্দর ইংলণ্ডদেশীয় আইভি লতায় সমাচ্ছন্ন ছিল। এই গৃহসংলগ্ন প্রাচীন ধরণের উদ্যানটিই ছিল আমার শৈশবের নন্দনকানন।

আমার শিক্ষয়িত্রী আমাদের বাড়ীতে আসবার আগেও আমি হাতড়ে হাতড়ে চৌকো করে কাটা শক্ত বক্স-উডের বেড়া ধরে ধরে ঘুরে বেড়াতাম এবং ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে প্রথম ফুটে ওঠা ভায়োলেট ও লিলি ফুলগুলিকে খুঁজে বার করতাম। আবার রেগে উঠে খুব খানিকটা চেঁচামেচি করার পর ঐখানে গিয়েই আমি সান্ত্বনা পেতাম, আমার রোষোত্তপ্ত মুখখানিকে শীতল তৃণ-পল্লবের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকতাম। এই ফুলে ভরা বাগানের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা, মনের আনন্দে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো, তারপর সহসা মনোরম একটা দ্রাক্ষালতার কাছে এসে পড়া এবং পাতার স্পর্শে ও ফুলের গন্ধে সেটিকে চিনতে পেরে উপলব্ধি করা—এই তো সেই দ্রাক্ষালতা, বাগানের সুদূর কোণের ভাঙাচোরা কুঞ্জগৃহটিকে যে ছেয়ে রয়েছে!—আহা! সে আনন্দের কি আর তুলনা আছে! এইখানে আরও ছিল লতিয়ে-যাওয়া ক্লেমাটিসের ঝোপ, মাটির উপর নুয়ে-পড়া যুঁই ফুলের গাছ, আর কি একটা দুর্লভ সুগন্ধি ফুল,—নাম তার প্রজাপতি লিলি, কারণ তার ভঙ্গুর পাপড়ি গুলি দেখতে ছিল প্রজাপতির পাখনার মত।

আর ছিল গোলাপ। এই গোলাপগুলিই ছিল সবার সেরা। আমার সেই দক্ষিণাঞ্চলের বাসভবনের লতানে গোলাপের ফুলগুলি মনকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি দান করতে পারতো; উত্তরাঞ্চলের সযত্নরক্ষিত কোন পুষ্প-বাটিকায় আমি তেমন গোলাপ কখনও দেখতে পাই নি। লম্বা লম্বা লতার গায়ে মালার মত ফুটে তারা আমাদের গাড়ীবারান্দা থেকে ঝুলে থাকতো; সমস্ত বাতাস তাদের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠতো,—সে গন্ধে পার্থিব গন্ধের বিন্দুমাত্র মালিন্য মেশানো থাকতো না। আর অতি প্রত্যুষে শিশির-ধোয়া ফুলগুলিকে হাত দিয়ে ছুঁলে এত কোমল, এত পবিত্র বলে মনে হতো যে মাঝে মাঝে আমি না ভেবে থাকতে পারতাম না যে, ভগবানের বাগানের পারিজাত ফুলগুলি বোধ হয় এদেরই মত দেখতে।

আমার জীবনের প্রারম্ভের মধ্যে কোন জটিলতা নেই; আর সব শিশুদের জীবনে যেমন হয়ে থাকে ঠিক তেমনি। আমি ভূমিষ্ঠ হবার পরই চোখ মেলে চাইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সবার হৃদয় জয় করে নিলাম। পরিবারের প্রথম শিশুটি চিরকালই তাই করে থাকে। সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে, আমার নামকরণ নিয়ে তেমনি খানিকটা আলোচনা হয়েছিল। সবাই খুব জোর দিয়ে এই কথাটাই বলেছিলেন যে, পরিবারের প্রথম শিশুর যা তা একটা নাম দেওয়া কিছুতেই চলবে না। বাবা প্রস্তাব করলেন, আমার নাম রাখা হোক মিলড্রেড ক্যাম্বেল কারণ ঐ নামের একজন প্রাচীনা আত্মীয়াকে তিনি বড় শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হবার পর থেকে আর তিনি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নি। অবশেষে মা এই সমস্যার সমাধান করলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তাঁর মা, অর্থাৎ আমার দিদিমার নামে আমার নাম রাখা হোক। বিবাহের পূর্বে দিদিমার নাম ছিল হেলেন এভারেট। কিন্তু আমাকে কোলে করে গির্জায় নিয়ে যাবার হাঙ্গামায় বাবা পথের মধ্যে নামটি হারিয়ে ফেললেন। এতে

আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, কারণ এই নামটি পছন্দ করার ব্যাপারে তিনি কোনরকম অংশ গ্রহণ করেন নি। যখন পুরোহিত ঠাকুর নামের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তাঁর এইটুকুই শুধু মনে পড়লো যে আমার ঠাকুরমা কি দিদিমা কার যেন নামানুসারে আমার নামকরণ হবে স্থির হয়েছে। তিনি তখন ঠাকুরমার নামটিই বলে দিলেন,—হেলেন অ্যাডামস্।

আমি শুনেছি যে, আমি যখন লম্বা ঝুলওয়ালা পোষাক পরেই লোকের কোলে চড়ে বেড়াতাম, তখনই নাকি আমি খুব উৎসুক ও জেদী স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিলাম। অন্যকে কিছু করতে দেখলে ঠিক তাই নাকি আমি করতে চাইতাম। ছ'মাস বয়সে আমি বাঁশীর মত সরু গলায় "কেমন আছেন ?"—বলতে পারতাম, আর একদিন নাকি বেশ স্পষ্টস্বরে "চা, চা, চা" বলে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। জীবনের প্রথম এই কয় মাসে যে কটি কথা শিখেছিলাম, অসুখ হবার পরেও তার একটি কথা আমার মনে ছিল। এই কথাটি হচ্ছে "water"—জল। আমার অন্যরূপ বাকশক্তি নষ্ট হয়ে যাবার পরেও আমি একটা আওয়াজ করে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করতাম। কথাটি শুদ্ধভাবে বানান করতে শিখবার পর তবে আমি এই "wah-wah" আওয়াজ বন্ধ করি।

লোকের মুখে শুনেছি, এক বছর ঠিক যেদিন আমার বয়স হয় সেইদিন আমি হাঁটতে শিখি। মা আমাকে সবেমাত্র স্নানের টব্ থেকে তুলে নিয়ে কোলে নিয়েছেন, এমন সময় সহসা মসৃণ মেঝের উপরকার সূর্য্যকিরণে নৃত্যচঞ্চল গাছের পাতার কম্পমান ছায়াগুলির দিকে আমার চোখ পড়লো। মায়ের কোল থেকে তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ে আমি প্রায় দৌড়ে সেগুলির দিকে ছুটে গেলাম। তারপর ঝোঁকটা কেটে যেতেই আছাড় খেয়ে পড়ে গেলাম এবং মায়ের কোলে উঠবার জন্য কান্না জুড়ে দিলাম।

এই সুখের দিনগুলি কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। রবিন্ ও

মকিংবার্ড পাখির সঙ্গীত-কাকলী-মুখরিত ছোট্ট একটি বসন্ত, গোলাপ ফুল ও নানা ফলসম্ভারে সমৃদ্ধ একটি গ্রীষ্মঋতু এবং সোনালি ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত একটি হেমন্ত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে গেল ;—একটি সমুৎসুক পরিতৃপ্ত শিশুর পায়ের কাছে উজাড় করে দিয়ে গেল তাদের নানা উপঢৌকনের ডালি। তারপর হিমজর্জর ফেব্রুয়ারী মাসে এল সেই কাল ব্যাধি, ফলে আমার চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে গেল, নবজাত শিশুর মত আমি পরিপূর্ণ চেতনাহীনতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলাম। আমার ব্যাধি ছিল নাকি পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের সুতীব্র প্রদাহ। ডাক্তারবাবু ভেবেছিলেন আমি আর বাঁচবে না। কিন্তু আমার জ্বর যেমন সহসা ও রহস্যময় ভাবে শুরু হয়েছিল একদিন প্রত্যুষে ঠিক তেমনি ভাবেই ছেড়ে গেল। সেদিন প্রভাতে আমাদের সংসারে খুব একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ সেদিন বুঝতে পারে নি যে আর কোনদিন আমি চোখে দেখতেও পাবো না, কানে শুনতেও পাবো না। ডাক্তারবাবু নিজেও কিছু বুঝতে পারেন নি।

আমার মনে হয়, এখনও যেন সেই ব্যাধির কোন কোন কথা অস্পষ্ট ভাবে আমার স্মরণ আছে। বিশেষভাবে মনে পড়ে, বিরক্তি ও যন্ত্রণার জন্য যখন ঘুমোতে পারতাম না তখন কি অপরিসীম মমতার সঙ্গে মা আমার যন্ত্রণা উপশম করবার চেষ্টা করতেন। আমার মনে পড়ে, একদিন অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় কিছুক্ষণ ধরে ছটফট করার পর জেগে উঠে, যে আলো আগে এত ভালবাসতাম, বিশুষ্ক ও উত্তপ্ত চক্ষুর্দ্বয়কে যখন সেই আলো থেকে দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিতে হলো, তখনকার সেই বিহ্বল ও বেদনার্ত মনোভাব। আমার চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবীর আলো তখন প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠছে। জানি না এগুলো সত্য সত্যই স্মৃতি কি না। যদি তাই হয়, তাহলে এই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো ছাড়া সমস্ত

ব্যাপারটা আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্নের মত অতি অবাস্তব হয়ে রয়েছে। ক্রমশঃ আমার চারিদিকের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারে আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম,—ভুলে গেলাম যে কখনও এ ছাড়া জীবনে অন্য কিছু ছিল যিনি আমার আত্মাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেন আমার সেই শিক্ষয়িত্রী না আসা পর্য্যন্ত এই ভাবেই দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু জীবনের প্রথম উনিশটি মাস আমি বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, সমুজ্জ্বল আকাশ, বৃক্ষলতা ও নানা ফুলের দর্শন লাভ করেছিলাম; পরবর্ত্তী কালের অন্ধকার তাদের স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে পারে নি। কারণ, একবার যদি চোখে দেখা যায়, তাহলেই "দিনের আলো, আর দিনের আলো যা কিছু দেখায় তা সবই আমাদের নিজস্ব হয়ে যায়।"

দুই

আমার ব্যাধির পর প্রথম কয়েক মাস কি ঘটেছিল তা আর আমার মনে নেই। আমার শুধু এইটুকু স্মরণ আছে যে, আমার মা যখন গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন তখন হয় আমি তাঁর কোলে বসে থাকতাম আর না হয়তো তাঁর আঁচল ধরে ধরে ঘুরে বেড়াতাম। হাত দিয়ে আমি প্রতিটি বস্তু অনুভব করতাম, প্রত্যেক জিনিসের নড়াচড়া লক্ষ্য করতাম। এই ভাবে আমি অনেক জিনিস চিনতে শিখেছিলাম। শীঘ্রই আমি অন্য লোকজনের সঙ্গে মনোভাব আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলাম এবং মোটা-মুটি ধরণের আকার-ইঙ্গিত ব্যবহার করতে শুরু করলাম। মাথা নাড়া দিয়ে বোঝাতাম "না", সামনের দিকে মাথা ঝুকিয়ে বোঝাতাম "হাঁ"; টেনে বোঝাতাম "এস"; ধাক্কা দিয়ে বোঝাতাম "যাও"। যদি আমার রুটি কাটার প্রয়োজন হতো, তাহলে ছুরি দিয়ে রুটি কাটার এবং রুটিতে মাখন মাখাবার অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করে দেখাতাম। আমার যদি ইচ্ছা হতো মা আমার

মধ্যাহ্নভোজনের জন্য আইসক্রিম তৈরী করুন, তাহলে হাত দিয়ে বরফ-জমানো কল চালানোর ভঙ্গি করে দেখাতাম আর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা জিনিস বুঝিয়ে দিতাম। তা ছাড়া আমার মাও যখন আমাকে কোন জিনিস নিয়ে আসতে বলতেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারতাম, এবং দোতলায় বা অন্য যেখানে তিনি যেতে বলতেন সেখানে দৌড়ে চলে যেতাম। সত্য কথা বলতে কি, আমার সেই সুদীর্ঘ অন্ধকার নিশীথিনীর মধ্যে যা কিছু ছিল আনন্দময়, যা কিছু ছিল ভালো, তার সব কিছুর জন্যই আমি তাঁরই ভালোবাসা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে ঋণী ছিলাম।

আমার চারিপাশে কি ঘটছে তার অনেকখানি আমি বুঝতে পারতাম। পাঁচ বছর বয়সে, ধোপার বাড়ী থেকে কাচা কাপড় এলে, আমি সেগুলি ভাঁজ করে তুলে রাখতে শিখেছিলাম; অন্যান্য বস্ত্রাদির মধ্য থেকে আমার নিজের কাপড়চোপড় বেছে নিতেও শিখেছিলাম। আমার মা ও কাকীমার পোষাক পরবার ধরণ দেখে আমি বুঝতে পারতাম তাঁরা বাইরে যাচ্ছেন কি না, এবং তাঁরা যখনই বেরুতেন তখনই তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইতাম। বাড়ীতে অতিথি-অভ্যাগত এলে আমাকে ডেকে পাঠানো হতো। তাঁরা যখন চলে যেতেন তখন হাত নেড়ে আমি তাঁদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতাম; মনে হয় যেন, এই ভাবে হাত নাড়ার মানে কি, তাও অস্পষ্টভাবে আমার মনে ছিল। একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সদর দরজা বন্ধ করার ও তাঁদের আগমনসূচক অন্যান্য ধ্বনির কম্পন আমি অনুভব করতে পারলাম। হঠাৎ কি মনে হলো, কেউ আমাকে ধরে ফেলবার আগেই আমি ছুটে দোতলায় চলে গেলাম ও অতিথিদের সামনে যে রকম সাজ করে বেরুনো উচিত বলে আমার ধারণা ছিল সেই রকম সাজগোজ শুরু করে দিলাম। আর সবাইকে যেমন করতে দেখেছি তেমনি ভাবে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় বেশ জবজবে করে তেল মেখে নিলাম এবং মুখের উপর পুরু করে

পাউডারের প্রলেপ লাগিয়ে দিলাম। তারপর একটা ওড়না নিয়ে পিন্ দিয়ে সেটা মাথায় আটকে দিলাম,—ওড়নাটা মুখ ঢেকে ভাঁজে ভাঁজে কাঁধ পর্যন্ত এসে পড়লো। তা ছাড়া প্রকাণ্ড একটা কোমর ফাঁপানো প্যাড্ আমার সরু কটিদেশের চারিদিকে এমন ভাবে জড়িয়ে বাঁধলাম যে সেটা প্রায় আমার পোষাকের প্রান্ত পর্যন্ত ঝুলে রইল। এমনি ভাবে সাজসজ্জা সম্পূর্ণ করে আমি অতিথিদের সম্বর্ধনায় সাহায্য করবার জন্য নীচে নেমে এলাম।

আমি যে অন্যান্য মানুষের মত নই, একথা আমি কবে প্রথম বুঝতে পারলাম তা আমার মনে নেই। কিন্তু আমার শিক্ষয়িত্রী আমাদের বাড়ীতে এসে পৌঁছুবার আগেই আমি কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, আমার মা ও আমার বন্ধুবান্ধবেরা যখন কাউকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে চাইতেন, তখন তাঁরা আমার মত অঙ্গভঙ্গি করতেন না, মুখ দিয়ে কথা বলতেন। দুজন লোক যখন কথা বলতেন তখন মাঝে মাঝে আমি তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে দেখতাম; কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠতাম। আমি ও আমার ঠোঁট নাড়তাম, পাগলের মত প্রাণপণে হাত দিয়ে ইসারা করতাম, কিন্তু ফল কিছুই হতো না। এই জন্য মাঝে মাঝে আমার এতো রাগ হতো যে ক্রমাগত লাথি ছুঁড়ে ছুঁড়ে চীৎকার করে কাঁদতে থাকতাম, অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হতাম না।

আমি যখন দুষ্টামি করতাম তখন আমি তা বুঝতে পারতাম বলেই মনে হয়, কারণ আমি বেশ জানতাম যে আমার নার্স এলা-র গায়ে লাথি মারলে তার ব্যথা লাগে। তাছাড়া ক্রোধের উত্তেজনার উপশম হবার পর মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা ভাবও হতো। কিন্তু কোন জিনিস চেয়ে না পেলে এই অনুভূতির ফলে পুনরায় দুষ্টামি করা থেকে বিরত হয়েছি এমন একটাও দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ে না।

এই সময়ে আমার সদা সর্বদার সঙ্গী ছিল দুটি প্রাণী,—আমাদের রাঁধুনীর মেয়ে, মার্থা ওয়াশিংটন নামে ছোট্ট একটি নিগ্রো বালিকা, আর বেল্ নামক একটা বুড়ো 'সেটার' জাতীয় কুকুর। এই কুকুরটা যৌবনে খুব বাহাদুর শিকারী ছিল। মার্থা ওয়াশিংটন আমার সব ইঙ্গিত বুঝতে পারতো; তাকে দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে আমার মোটেই বেগ পেতে হতো না। তার উপর মাতব্বরি করে আমি খুব আনন্দ পেতাম, আর সেও হাতাহাতি লড়াই-এর ঝুঁকি এড়াবার জন্য সাধারণতঃ আমার সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যেত। আমার গায়ে বেশ জোর ছিল,—আমি খুব কর্মঠও ছিলাম, তাছাড়া কৃতকর্মের ফলাফলের জন্য বিন্দুমাত্র পরোয়া করতাম না। নিজে কি চাই সে সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার ধারণা ছিল, যেন তেন প্রকারেণ কার্যোদ্ধার করিয়ে নিতে পারতাম; সে জন্য যদি আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করতে হতো, তাতেও গররাজি ছিলাম না। আমরা রান্নাঘরে অনেক সময় কাটাতাম,- মাখা ময়দার তাল ঠাসতাম, আইসক্রিম তৈরি করতে সাহায্য করতাম, কফি গুঁড়ো করতাম, কেকের গামলা নিয়ে ঝগড়া করতাম, আর রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর যে সব মুর্গি ও টার্কি পাখি জটলা করতো তাদের খেতে দিতাম। এদের মধ্যে অনেকগুলি এত পোষ-মানা ছিল যে আমাদের হাত থেকে খাবার নিয়ে খেত, আমি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলে পালিয়ে যেত না। একদিন একটা মস্ত বড় মদ্দা টার্কি আমার হাত থেকে একটা টম্যাটো ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় এই টার্কি মহোদয়ের চৌর্যবৃত্তির সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমরা একবার একখানা আস্ত কেক চুরি করে নিয়ে কাঠের গাদার কাছে পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আমাদের রাঁধুনী তখন সবেমাত্র কেকখানাকে দানাদার চিনি দিয়ে মুড়ে রেখেছিল। আমরা কেকখানাকে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছিলাম। পরে আমার খুবই পেটের

অসুখ হয়েছিল। তাই এখন মাঝে মাঝে ভাবি, টাকি'টারও কি আমাদের মত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল?

গিনি ফাউলের অভ্যাস হলো কোন অপ্রত্যাশিত গোপন স্থানে নিজের বাসা বাঁধা। লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে গিনি ফাউলের ডিম খুঁজে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগতো। ডিমের সন্ধানে বেরুবার ইচ্ছা হলে আমি মার্থা ওয়াশিংটনকে সেকথা বলতে পারতাম না। তখন আমি দুই হাত মুঠো করে মাটির উপর রাখতাম ;—এটা ছিল ঘাসের মধ্যে গোল গোল জিনিব বোঝাবার ইঙ্গিত। এ ইঙ্গিত মার্থা সব সময়ে বুঝতে পারতো। কোনদিন যদি সৌভাগ্যক্রমে আমরা একটা পাখির বাসা খুঁজে পেতাম, মার্থাকে আমি কখনও হাতে করে ডিম নিয়ে বাড়ী যেতে দিতাম না,—জোরে জোরে হাত নেড়ে সঙ্কেত করে বুঝিয়ে দিতাম, সে হয়তো আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে ডিম-গুলি সব ভেঙে ফেলবে। কতগুলি চালাঘরে শস্য গোলাজাত করে রাখা হতো, আস্তাবলে ঘোড়াগুলি থাকতো : একটা উঠানে সকাল বিকাল সমস্ত গরু নিয়ে এসে দুধ দোয়া হতো। এই স্থানগুলি আমাকে ও মার্থাকে এক অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট করতো। দোহনকারীরা যখন দুধ দুইত তখন তারা আমাকে গরুর গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিত। প্রায়ই আমাকে এই কৌতূহলের পুরস্কার স্বরূপ লেজের চাবুক খেতে হতো

বড়দিনের উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময়টা সর্বদাই আমার কাছে খুব একটা আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হতো। অবশ্য এ সবের মানে কি তা আমি কিছুই জানতাম না। কিন্তু বাড়ীময় নানা রকম সুগন্ধ ভুর ভুর করতো, আর আমাকে ও মার্থাকে ঠান্ডা রাখবার জন্য বহু টুকিটাকি সুখাদ্য খেতে দেওয়া হতো : এসব আমি খুবই উপভোগ করতাম। কাজের সময় ঘুর ঘুর করে বেড়ানোর ফলে আমরা অপরের খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করতাম, কিন্তু তাতে আমাদের আনন্দের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হতো না।

আমাদের মশলা গুড়ো করবার, কিসমিস বাছবার এবং রান্নার চামচগুলি চেটে খাবার অনুমতি দেওয়া হতো। আর সবাই তাদের মোজাগুলি ঝুলিয়ে রাখতো বলে আমিও তাই করতাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমি বিশেষ কোন আগ্রহ অনুভব করতাম না। কি কি উপহার পেলাম দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে ভোর হবার আগেই কখনও জেগেও উঠতাম না।

দুষ্টামি করতে আমি যতটা ভালবাসতাম মার্থা ওয়াশিংটনও ঠিক ততটাই বাসতো।—জুলাই মাসের এক গ্রীষ্মতাপতপ্ত অপরাহ্নে দুটি ছোট শিশু বারান্দার সিঁড়ির উপর বসে আছি। একটির রঙ আবলুসের মত কালো; মাথার শক্ত কোঁকড়ানো চুলগুলি জুতোর ফিতা দিয়ে ছোট ছোট গুচ্ছ করে বাঁধা; সারা মাথায় সেগুলি কর্ক-স্ক্রুর মত খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর একটি শ্বেতকায়, মাথায় লম্বা লম্বা সোনালি কেশ-গুচ্ছ। একটি শিশুর বয়স ছ'বছর, অপরটি তার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। ছোট শিশুটি অন্ধ,—সেই হচ্ছি আমি। অপরটি মার্থা ওয়াশিংটন। আমরা তখন খুব ব্যস্তভাবে কাগজ কেটে কেটে পুতুল তৈরি করছি। কিন্তু শীঘ্রই এ খেলা আর আমাদের ভালো লাগলো না। সুতরাং প্রথমে আমরা আমাদের জুতোর ফিতাগুলি কেটে ফেললাম, তারপর যতগুলি হনিসকলের পাতা আমাদের নাগালের মধ্যে ছিল সেগুলিও কেটে ফেললাম। তারপর আমার মনে পড়লো মার্থার মাথার কর্ক-স্ক্রুগুলির কথা। প্রথমে সে একটু আপত্তি তুললো, কিন্তু অবশেষে আমার প্রস্তাব মেনে নিল। তারপর তার মনে হলো, তার পালা শেষ হবার পর আমার পালা হওয়াই ন্যায়সংগত। কাঁচি হাতে নিয়ে সে খচ করে আমার একটি কেশগুচ্ছ কেটে ফেললো; মা এসে সময় মত বাধা না দিলে বোধ হয় বাকিগুলিও সব কেটে ফেলতো।

আমার দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল আমাদের কুকুর বেল্। সে বুড়ো বয়সে আলসে হয়ে পড়েছিল; আমার সঙ্গে ছুটোপাটি খেলা করার চেয়ে খোলা

চুল্লীর পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমোতে ভালোবাসতো। আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম তাকে আমার সঙ্কেতের ভাষা শিখিয়ে নিতে, কিন্তু তার বুদ্ধি-শুদ্ধিও ছিল না, মনোযোগও ছিল না। সে মাঝে মাঝে চমকে উঠে উত্তেজনায় কাঁপতে থাকতো। শিকারী কুকুর পাখি দেখলে যেমন করে থাকে তখন সে সেই রকম নিশ্চল হয়ে যেত। কেন সে এমন করছে সে সময় আমি তা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারতাম যে সে আমার ইচ্ছামত কাজ করছে না। এর ফলে আমি বিরক্ত হয়ে উঠতাম, শিক্ষা দেবার চেষ্টা শেষে এক-তরফা ঘুসির লড়াই-এ পরিণত হতো। বেল্ তখন উঠে দাঁড়াতো, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে একবার আড়ামোড়া ভাঙতো, দু'একবার তাচ্ছিল্যভরে ফোঁস্ ফোঁস্ করতো, তারপর চুল্লীর অপর দিকে সরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়তো। ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে আমিও বেরিয়ে পড়তাম মার্থার সন্ধানে।

প্রথম জীবনের সেই কটি বছরের অনেকগুলি ঘটনা আমার স্মৃতিপটে চিরস্থায়ী হয়ে আছে,—পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কিন্তু স্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল! সেই ধ্বনিহীন, উদ্দেশ্যহীন, দিবালোকহীন জীবনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটিকে এরাই আমার কাছে আরও প্রগাঢ় করে তুলেছে।

একদিন আমি আমার বহির্বাসে দৈবাৎ জল ঢেলে ফেলি। আমাদের বসবার ঘরের চুল্লীতে তখন মিট্‌মিট্ করে আগুন জ্বলছিল। তারই সামনে দাঁড়িয়ে আমি সেটিকে শুকিয়ে নেবার জন্য মেলে ধরলাম। কিন্তু আমার যতটা তাড়াতাড়ি দরকার, বহির্বাস তত তাড়াতাড়ি শুকোচ্ছে না দেখে আমি আগুনের আরও কাছে এগিয়ে গেলাম এবং গন্‌গনে অঙ্গারের ঠিক উপরে সেটিকে ছড়িয়ে ধরলাম। আগুন তখুনি দপ্ করে জ্বলে উঠলো, আমি বহ্নিশিখায় বেষ্টিত হ'য়ে পড়লাম, এবং মুহূর্তমধ্যে আমার কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরে গেল। আমি ভয়ে অস্থির হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

চীৎকার শুনে আমার বুড়ী নার্স তিনি আমার সাহায্যার্থে ছুটে এল। আমাকে একটা কম্বল চাপা দিয়ে বুড়ী আমাকে প্রায় দম বন্ধ করে মেরেছিল, কিন্তু আগুনটা সে নিভিয়ে ফেললো। হাত দু'খানা আর চুল ছাড়া আমার আর কিছুই বেশী পুড়তে পায় নি।

এই সময়ে আমি আবিষ্কার করি, চাবি দিয়ে কি কাজ করতে হয়। একদিন সকালে আমি আমার মাকে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রাখি। তাঁকে সেখানে তিন ঘণ্টা আটক হয়ে থাকতে হয়, কারণ ঝি-চাকরেরা দূরে বাড়ীর একটা বিচ্ছিন্ন অংশে বাস করতো। মা ভিতর থেকে ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন, আর আমি বাইরে গাড়ীবারান্দার সিঁড়ির উপর বসে সেই ধাক্কার কম্পন অনুভব করছিলাম আর মনের আনন্দে হাসছিলাম। আমার এই মারাত্মক দুষ্টামির ফলেই আমার পিতামাতার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, যথাসম্ভব সত্বর আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমার শিক্ষয়িত্রী মিস সালিভান আমাদের বাড়ীতে আসবার পর তাঁকে তাঁর ঘরে চাবিবন্ধ করে রাখবার একটা সুযোগ আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। মা একদিন আমাকে কি একটা জিনিস দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে মিস্ সালিভানকে সেটা দিতে হবে। আমি জিনিসটা নিয়ে দু'তলায় গেলাম। কিন্তু সেটা তাঁর হাতে দিয়েই আমি দড়াম্ করে তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং দরজার তালা বন্ধ করে দিয়ে চাবিটাকে হলঘরে পোষাকের আলমারির তলায় লুকিয়ে রেখে দিলাম। চাবিটা কোথায় আছে সেকথা আমাকে দিয়ে কেউ বলিয়ে নিতে পারলো না। শেষকালে বাবা বাধ্য হয়ে একটা মই নিয়ে এলেন এবং জানালা দিয়ে মিস্ সালিভানকে নীচে নামিয়ে নিয়ে এলেন। আমার আনন্দের অবধি রইল না। এর অনেক মাস পরে আমি চাবিটা বার করে দিয়েছিলাম।

আমার বয়স যখন প্রায় পাঁচ বছর তখন আমরা সেই ছোট্ট দ্রাক্ষালতা সমাচ্ছন্ন বাড়ীটি ছেড়ে একটা নূতন বড় বাড়ীতে উঠে যাই। আমাদের

সংসারে ছিলেন আমার বাবা আর মা এবং আমার দুই বড় সৎভাই; পরে মিলড্রেড নামে আমার এক ছোট বোনের জন্ম হয়। বাবার সম্বন্ধে সব চেয়ে আগেকার যে স্মৃতি আমার মনে আছে সেটা হচ্ছে এই : খবরের কাগজের বড় বড় স্তূপের ভিতর দিয়ে ঠেলেঠুলে পথ করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, একখানা কাগজ মুখের সামনে খুলে ধরে বাবা একা বসে আছেন। তিনি কি করছেন বুঝতে না পেরে আমি খুবই বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তাঁর কাজের অনুকরণ করে দেখলাম; এমন কি তাঁর চশমা জোড়াটি পর্যন্ত নাকে পরে নিলাম, ভাবলাম বোধ হয় চশমার সাহায্যে এই রহস্যের সমাধান করতে সমর্থ হব। কিন্তু বেশ কয়েক বৎসর ধরে এ রহস্যের সমাধান আমি করতে পারি নি। তারপর আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই কাগজগুলি কি বস্তু, আর জানতে পেরেছিলাম যে ওর মধ্যে একটা কাগজের সম্পাদক আমার বাবা।

বাবা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল ছিলেন। গৃহের প্রতি তাঁর খুব অনুরাগ ছিল। শিকারের মরসুমে ছাড়া তিনি আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতেন না। শুনেছি তিনি মস্ত বড় শিকারী ছিলেন,—বন্দুক চালনার নৈপুণ্যের জন্য প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নিজের পরিবারের পরই তিনি ভালোবাসতেন তাঁর কুকুর গুলিকে ও বন্দুকটিকে। তাঁর আতিথ্য ছিল অপর্যাপ্ত, প্রায় বাড়াবাড়ির সামিল। একজন অতিথি সঙ্গে না নিয়ে তিনি প্রায় কখনই ঘরে ফিরতেন না। তাঁর প্রকাণ্ড বাগানটি ছিল তাঁর বিশেষ গর্বের বস্তু। শোনা যায়, তাঁর এই বাগানেই নাকি জেলার মধ্যে সবচেয়ে ভালো তরমুজ ও 'স্ট্রবেরি' উৎপন্ন হতো। প্রথম যে আঙুরগুলি পেকে উঠতো সেইগুলি আর বাগানের বাছা বাছা 'বেরি'গুলি তিনি আমার জন্য নিয়ে আসতেন। এখনও আমার বেশ মনে আছে,—এক গাছ থেকে অন্য গাছের কাছে, এক দ্রাক্ষালতা থেকে অন্য দ্রাক্ষালতার কাছে তিনি

আমাকে নিয়ে বসেছেন, আমার গায়ে তাঁর স্নেহকোমল স্পর্শ লাগছে। আমি কোন জিনিস পেয়ে খুসি হলে তাঁরও সে কি সাগ্রহ আনন্দ!

বাবা গল্প-বলিয়ে হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। আমি যখন ভাষার ব্যবহার আয়ত্ত করেছি সেই সময়ে তিনি আমার হাতের মধ্যে আঙুল দিয়ে অপটু ভাবে বানান করে করে অনেক মজার মজার গল্প আমাকে বলতেন। ঠিক উপযুক্ত সময়ে আমাকে দিয়ে এই সব গল্পের পুনরাবৃত্তি করাতে পারলে তিনি যত খুসি হতেন তেমন আর কিছুতেই হতেন না।

আমি তখন উত্তরাঞ্চলে আছি, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ঋতুর মনোরম শেষ দিনগুলি উপভোগ করছি, এমন সময় বাবার মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে এসে পৌঁছুল। তিনি অতি অল্পদিন রোগভোগ করেন, স্বল্পকাল স্থায়ী নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের পরই সব শেষ হয়ে যায়। এই আমার প্রথম বড় শোক,—মৃত্যু সম্বন্ধে আমার প্রথম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

আমার মায়ের কথা আমি কেমন করে লিখবো? তিনি আমার এত কাছের জিনিস যে, তাঁর কথা বলতে গেলে মনে হয় বুঝি শালীনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছি।

বহুদিন ধরে আমি আমার ছোট বোনটিকে অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলেই ভাবতাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আর আমি একা আমার মায়ের আদরের ধন নই। একথা চিন্তা করলেই আমার মন ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো। যে মায়ের কোলে একদিন আমি বসে থাকতাম সেখানে আমার বোন আজকাল সব সময়ে বসে থাকে; তার জন্যই মায়ের সমস্ত সময়, সমস্ত যত্ন ব্যয়িত হয়। একদিন এমন একটা ব্যাপার ঘটলো যাতে মনে হলো যেন আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে।

এই সময়ে আমার একটা পুতুল ছিল। তাকে আমি যেমন অতিমাত্রায়

আদর করতাম তেমনি অতিমাত্রায় হেনস্থাও করতাম। পরে এই পুতুলটির আমি নাম দিয়েছিলাম ন্যান্সি। ন্যান্সির বরাত মন্দ; তাকে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে আমার ক্রোধ ও ভালোবাসা দুই-এরই উচ্ছ্বাস সহ্য করতে হতো। ফলে সে বেশ একটু বেমেরামত হয়ে পড়েছিল। আমার অনেক পুতুল ছিল। তাদের কেউ বা কথা বলতে পারতো, কেউ বা কাঁদতে পারতো, কেউ বা চোখ মেলতে ও চোখ বুজতে পারতো। কিন্তু বেচারী ন্যান্সিকে আমি যত ভালোবাসতাম এত তাদের কাউকে বাসতাম না। তার একটি দোলনা ছিল; প্রায়ই আমি এক ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় বসে বসে তাকে এই দোলনায় শুইয়ে দোল দিতাম। এই পুতুল আর এই দোলনা আমি সব সময়ে অতি সতর্ক পাহারায় রাখতাম। কিন্তু একদিন আমি দেখতে পেলাম, আমার ছোট বোন এই দোলনায় শুয়ে চুপ করে ঘুমুচ্ছে। তখনও আমার বোনের সঙ্গে কোন রকম ভালোবাসার বন্ধন আমার স্থাপিত হয় নি। কাজেই তার এই স্পর্ধায় আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম। তখনি আমি দোলনার কাছে ছুটে গিয়ে সেটা উলটে দিলাম। মাটিতে পড়বার আগেই যদি আমার বোনকে মা ধরে না ফেলতেন তাহলে বোধ হয় সেদিন সে মারাই যেত। আমাদের যখন দ্বিবিধ নির্জনতার উপত্যকা পথে চলতে হয়, তখন এমনিই হয়ে থাকে। স্নেহময় আলাপ, আচরণ ও সাহচর্যের মধ্য দিয়ে যে সুমধুর মমতার সৃষ্টি হয়, তখন আমরা তার কোন খবরই রাখি না। কিন্তু পরে যখন আমি আমার মানবীয় অধিকার ফিরে পেয়েছিলাম, তখন মিলড্রেড ও আমি পরস্পরের অতি প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। সে আমার আঙুলের ভাষা বুঝতে পারতো না, আমিও তার শিশুসুলভ কলকাকলী বুঝতে পারতাম না; তথাপি তখন যেদিকে যেতে আমাদের খেয়াল হতো সেইদিকেই আমরা দু'টিতে মনের আনন্দে হাত ধরাধরি করে চলে যেতে প্রস্তুত ছিলাম।

তিন

ইত্যবসরে মনের ভাব প্রকাশ করবার ইচ্ছা আমার বেড়েই চললো। যে ক'টি ইংগিত আমি ব্যবহার করতাম ক্রমশঃই সেগুলি দিয়ে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগলো। ফলে যতবার নিজের বক্তব্য পরকে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হতাম ততবারই অনিবার্য ক্রোধের আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়তাম। মনে হতো যেন কতকগুলি অদৃশ্য হাত আমাকে ধরে-বেঁধে রেখেছে ; মুক্তিলাভের জন্য আমি পাগলের মত চেণ্টা করতে থাকতাম। ছটফট করে কোন লাভ হতো না, তবু ছটফট করতাম, কারণ আমার মনের মধ্যে প্রতিরোধ প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। এই রকম ঘটনার শেষে প্রায়ই আমি অবসন্ন হয়ে পড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিতাম। মা যদি কাছে থাকতেন তাহলে তাঁর কোলে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসতাম, দুঃখে অভিভূত হয়ে অনেক সময় ভুলেই যেতাম কেন এত হৈ-চৈ করলাম। আরও কিছুদিন পরে ভাবের আদান-প্রদানের তাগিদ এত প্রবল হয়ে উঠলো যে, প্রতিদিন—কখনও কখনও ঘণ্টায় ঘণ্টায়—আমি এই রকম হাঙ্গামা বাধাতে শুরু ক'রে দিলাম।

বাবা ও মা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। অন্ধ ও বধিরদের শিক্ষা দেওয়া হয় এমন কোন স্কুল থেকে আমরা বহুদূরে বাস করতাম। বধির ও অন্ধ একটি শিশুকে শিক্ষা দেবার জন্য কেউ যে টাস্কাম্বিয়ার মত সুদূর অঞ্চলে আসতে রাজি হবে তাও সম্ভব বলে মনে হলো। সত্য কথা বলতে কি আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে সন্দেহ প্রকাশ করতেন আমাকে আদৌ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে কি না।

ডিকেন্সের "আমেরিকান নোট্স্" নামক বই থেকে মা তাঁর একমাত্র আশার রশ্মির সন্ধান পেয়েছিলেন। এই বই-এ ডিকেন্স্ লরা ব্রিজম্যানের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তিনি পড়েছিলেন। তাঁর অস্পষ্টভাবে মনে ছিল যে এই লরা ব্রিজম্যান অন্ধ ও বধির ছিলেন; তথাপি তিনি শিক্ষালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এতে মায়ের হতাশা ও মনোবেদনার উপশম হয়নি। কারণ তাঁর একথাও মনে ছিল যে, যে ডাঃ হাউ অন্ধ ও বধিরদের শিক্ষাদানের উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি বহুদিন হলো ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষা পদ্ধতিও লোপ পেয়েছে। আর তা যদি নাও পেয়ে থাকে, তথাপি আলাবামার এই সুদূর সহরের ছোট্ট একটি বালিকার পক্ষে কি করে সেই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে কোন উপকার লাভ করা সম্ভব হবে।

আমার বয়স যখন ছ'বছরের কাছাকাছি, তখন বাবা বাল্টিমোর সহরের একজন বিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসকের নাম শুনতে পেলেন। অন্য সবাই আশা ছেড়ে দেবার পরও নাকি ইনি অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাবা ও মা তৎক্ষণাৎ স্থির করলেন আমাকে তাঁরা বাল্টিমোর সহরে নিয়ে যাবেন,—দেখবেন আমার চোখের জন্য কিছু করা যায় কি না।

এই ভ্রমণের কথা আমার বেশ মনে আছে;—আমার খুব ভালো লেগেছিল। রেলগাড়ীতে আমি অনেক লোকের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছিলাম। একজন মহিলা আমাকে এক বাক্স কড়ি ও ঝিনুক দিয়েছিলেন। বাবা আবার এইগুলিতে ফুটো করে দিয়েছিলেন, তার মধ্য দিয়ে সুতো পরিয়ে পরিয়ে আমি মালা গাঁথতে পারতাম। এই কড়ি আর ঝিনুকগুলো নিয়ে আমি বহুকাল বেশ আনন্দে ছিলাম। রেলগাড়ীর কনডাকটরটিও আমার প্রতি খুব সদয় ছিল। অনেক সময় সে যখন ঘুরে ঘুরে টিকিট আদায় করে ও টিকিট পাঞ্চ করে বেড়াতো, আমি তাঁর জামার খুঁট চেপে ধরে তার

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। সে তার টিকিট পাঞ্চ্ করার যন্ত্রটি নিয়ে আমাকে খেলতে দিত। এটি বড় মজার খেলনা ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আসনের এক কোণে গুটি সুটি হয়ে বসে পিসবোর্ডের টুকরোর উপর এই যন্ত্র দিয়ে নানা রকম মজাদার ছোট ছোট ছিদ্র করে আমি ভারীআনন্দ পেতাম।

কাকীমা তোয়ালে দিয়ে আমাকে একটা বড় পুতুল তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই হাতে গড়া পুতুলটি একটা বেঢপ কিম্ভূতকিমাকার ধরণের বস্তু ছিল। এর নাক মুখ চোখ কান কিছুই ছিল না; শিশু-কল্পনার সাহায্যেও মুখমণ্ডল বলে মনে করা যায় শরীরের এমন কোন অংশও ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর অন্য সমস্ত খুঁত একত্র মিলে আমাকে যতটা উতলা করে তুলেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী করেছিল এর চোখের অভাব। বিরক্তিকর জিদের সঙ্গে আমি ক্রমাগত প্রত্যেককে এই ব্যাপারটা দেখিয়ে দিতে লাগলাম, কিন্তু পুতুলের চক্ষুদানকার্য কারও দ্বারা সম্ভব হলো না। সহসা একটা চমৎকার উপায়ের কথা আমার মনে পড়লো; সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমি হুড়মুড় করে আসন থেকে নেমে পড়ে আসনের নীচে হাতড়ে হাতড়ে কাকীমার আংরাখাটি টেনে বার করলাম। এর আঁচলায় বড় বড় রঙীন কাচের পুঁতি পরানো ছিল। দু'টি পুঁতি একটানে ছিঁড়ে নিয়ে কাকীমাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, তিনি এই দুটিকে আমার পুতুলের মুখে সেলাই করে দিন এই আমি চাই। তিনি আমার হাত ধরে প্রশ্নসূচক ভাবে তাঁর চোখে ঠেকালেন; আমি জোরে জোরে মাথা নেড়ে বোঝালাম, "হাঁ"। তখন ঠিক ঠিক জায়গায় পুঁতি দুটিকে সেলাই করে দেওয়া হলো। আমার মনে আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই এই পুতুলের প্রতি আমার সমস্ত স্নেহ মমতা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। সমগ্র ভ্রমণকালের মধ্যে একবারও আমি মেজাজ খারাপ করে হাঙ্গামা বাধাই নি। কত রকমের নূতন জিনিস নিয়ে আমার

মন আর হাতের আঙুলে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতো! মেজাজ খারাপের অবসরই ছিল না!

অবশেষে আমরা বালটিমোরে এসে পৌঁছুলাম। ডাঃ চিজহোম আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই করতে পারলেন না। তবে তিনি বলে দিলেন, আমাকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তিনি বাবাকে পরামর্শ দিলেন ওয়াশিংটনের ডাঃ গ্রেহাম বেল-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে। অন্ধ ও বধির ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয় ও শিক্ষক সংক্রান্ত সব সংবাদই নাকি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। এই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ডাঃ বেল্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য অবিলম্বে ওয়াশিংটনে চলে গেলাম। বাবার মন তখন দুঃখভারাক্রান্ত, নানা দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ; আমি কিন্তু তাঁর মনোবেদনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণের উত্তেজনায় আনন্দে অধীর। যদিও আমি তখন শিশু মাত্র, তথাপি ডাঃ বেল্-এর মমতা ও সহানুভূতির স্পর্শ অনুভব করতে আমার একটুও দেরী হয় নি। চিকিৎসা-জগতে নানা অসাধারণ সাফল্যের দ্বারা ডাঃ বেল্ যেমন সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, তেমনি তাঁর এই স্বভাবসিদ্ধ সহানুভূতি ও মমতা তাঁকে সকলের প্রিয়পাত্রও করে তুলেছিল। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে বসলেন; আমি তাঁর ঘড়িটি নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম। ঘড়িটি বাজিয়ে আমাকে তিনি তার কম্পন অনুভব করতে দিলেন। তিনি আমার সব ইঙ্গিতের মানে বুঝতে পারছেন একথা আমি যেই বুঝতে পারলাম, তখুনি তাঁর প্রতি প্রীতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠলো। কিন্তু তখনও আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে, তাঁর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার আমার সামনে এমন একটা দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে, যার ভিতর দিয়ে আমি অন্ধকার থেকে আলোকের জগতে, নিঃসঙ্গতা থেকে বন্ধুত্ব, সাহচর্য, জ্ঞান ও প্রেমের জগতে প্রবেশ করতে পারবো।

ডাঃ বেল বাবাকে পরামর্শ দিলেন বস্টনের পার্কিন্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউশনের কর্মাধ্যক্ষ মিঃ আনাগ্‌নসের কাছে চিঠি লিখে খোঁজ নিতে যে, আমার শিক্ষা শুরু করে দিতে পারেন এমন কোন শিক্ষক তার হাতে আছে কি না। এই পার্কিন্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউশনই ছিল অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য ডাঃ হাউ-এর মহান প্রচেষ্টার কর্মক্ষেত্র। বাবা তৎক্ষণাৎ চিঠি দিলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মিঃ আনাগ্‌নসের সহৃদয়তাপূর্ণ উত্তর এসে পৌঁছুল; তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, একজন শিক্ষক পাওয়া গেছে। এ সব হচ্ছে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের ঘটনা। কিন্তু আমার শিক্ষয়িত্রী মিস্‌ সালি-ভান পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসের আগে এসে পৌঁছুতে পারেন নি।

এইভাবে আমি মিশরের নির্বাসন থেকে বেরিয়ে সিনাই পর্বতের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম? এক স্বর্গীয় শক্তির স্পর্শলাভ করে আমার আত্মার চক্ষু উন্মীলিত হলো; আমি অনেক পরমাশ্চর্য বস্তু প্রত্যক্ষ করলাম। আর শুনতে পেলাম, সেই সুপবিত্র পর্বত থেকে একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে,—ঘোষণা করছে, "জ্ঞানই প্রেম, জ্ঞানই আলোক, জ্ঞানই দৃষ্টিশক্তি।"

চার

আমার সমগ্র জীবনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিনটির কথা আমার মনে আছে সেটি হচ্ছে সেই দিন যেদিন আমার শিক্ষয়িত্রী অ্যান্‌ ম্যান্‌স্‌ফিল্‌ড্‌ সালিভান আমার কাছে আসেন। এই দিনটি আমার জীবনের দুটি অংশের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিল। এই দুটি অংশের মধ্যে যে অপরিমেয় পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তার কথা চিন্তা করলে আমার

মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারিখটি ছিল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ। আমার বয়স সাত বছর পূর্ণ হবার তখনও তিন মাস বাকি।

সেই ঘটনাবহুল দিবসের অপরাহ্নে আমি নির্বাক্ ও উৎসুকভাবে আমাদের গাড়ীবারান্দার উপর দাঁড়িয়েছিলাম। মায়ের ভাবভঙ্গি ও বাড়ীর মধ্যে লোকজনের দ্রুতপদে চলাফেরা থেকে অস্পষ্টভাবে অনুমান করছিলাম যে, শীঘ্রই কি একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটবে। সুতরাং আমি দরজার কাছে গিয়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হনিসকল্ লতাগুচ্ছে গাড়ীবারান্দা সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। অপরাহ্নের সূর্যকিরণ তার ভিতর দিয়ে এসে আমার উদ্‌গ্রীব মুখের উপর পড়ছিল। প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই অতি-পরিচিত পত্রপুষ্পগুলির উপর আমি আমার আঙুল বুলাচ্ছিলাম। দক্ষিণাঞ্চলের সুমধুর বসন্ত ঋতুকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এরা তখন সবেমাত্র উদ্‌গত হয়েছিল। আমার জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে যে কি অলৌকিক সম্ভাবনা, কি অপরূপ বিস্ময় নিহিত রয়েছে তা আমি তখন কিছুই জানতাম না। এর আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত আমার মনের উপর দিয়ে ক্রোধ ও তিক্ততার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আবেগ ও উত্তেজনার অবসানে এখন এসেছিল সুগভীর অবসাদ।

আপনারা কি কখনও সমুদ্রবক্ষে ঘন কুয়াশার মধ্যে পড়েছেন? মনে হয় যেন এক শুভ্র অন্ধকারে চারিদিক অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে,—যেন তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে! প্রকাণ্ড জাহাজখানা যেন উদ্বেগ ও নিরুদ্ধ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে; ওলনদড়ির সাহায্যে জল মেপে মেপে হাতড়ে তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; আর আপনারা সবাই কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন কি ঘটে!—শিক্ষা আরম্ভ হবার আগে আমার অবস্থা ছিল ঐ জাহাজের মত। কিন্তু আমার দিগ্‌দর্শন যন্ত্র বা জল মাপবার ওলনদড়ি কিছুই ছিল না,—আর কতদূরে গেলে পোতাশ্রয়ে পৌঁছুব তাও জানবার

কোন উপায় ছিল না। হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল নীরব আর্তনাদ, "আলো! আলো দাও!" ঠিক সেই সময়ে আমার মাথার উপরে প্রেমের সূর্যালোক প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো!

কার পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো। মা মনে করে হাত বাড়িয়ে দিলাম। কে যেন আমার হাত ধরলো। তারপর, যিনি আমাকে দুনিয়ার সব কিছু দেখিয়ে দিতে, চিনিয়ে দিতে এসেছিলেন, এবং সর্বোপরি আমাকে ভালোবাসতে এসেছিলেন, তিনি আমাকে কোলে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।

আমার শিক্ষয়িত্রী যেদিন এসে পৌঁছলেন তার পরদিন সকালে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি আমাকে একটা পুতুল দিলেন। পার্কিন্স্ ইনস্টিটিউশনের ছোট ছোট অন্ধ ছেলেমেয়েরা এটি আমাকে উপহার পাঠিয়েছিল; লরা ব্রিজম্যান নিজে একে পোশাক পরিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এসব কথা তখন আমি কিছুই জানতে পারি নি, জেনেছিলাম অনেক পরে। আমি কিছুক্ষণ পুতুল নিয়ে খেলা করার পর মিস্ সালিভান ধীরে ধীরে আঙুল দিয়ে আমার হাতের মধ্যে "d-o-l-l" (পু-তু-ল) এই কথাটি বানান করে দিলেন। এই আঙুলের খেলাটি আমার ভারী মজার বলে মনে হলো। আমি তখুনি তার অনুকরণের চেষ্টা আরম্ভ করলাম। অবশেষে যখন আমি নির্ভুলভাবে অক্ষরগুলি তৈরি করতে শিখলাম, তখন ছেলেমানুষি আনন্দে ও গর্বে আমি একেবারে লাল হয়ে উঠলাম। তখুনি ছুটে নীচের তলায় মায়ের কাছে গিয়ে হাত দু'খানি তুলে তাঁকে "d-o-l-l" (পু-তু-ল) কথাটার অক্ষরগুলো তৈরি করে দেখালাম। আমি যে একটা কথা বানান করছি তা তখন আমি বুঝতে পারি নি, এমন কি "কথা" বলে যে কোন জিনিস আছে তাও তখন জানতাম না। আমি শুধু অনুকরণপ্রিয় বানরের মতন আঙুল নাড়ছিলাম। এর পরে কয়েকদিন ধরে এই রকম

কোন কিছু না বুঝে আমি অনেকগুলি কথা বানান করতে শিখলাম তার মধ্যে ছিল "pin" (আলপিন) "hat" (টুপি), "cup" (পেয়ালা), প্রভৃতি বিশেষ্য এবং "sit" (বসা), "stand" (দাঁড়ানো), "walk" (বেড়ানো) প্রভৃতি গুটিকয়েক ক্রিয়াপদ। কিন্তু আমার শিক্ষয়িত্রী কয়েক সপ্তাহ আমার কাছে থাকার পর তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সব জিনিসের একটা করে নাম আছে।

একদিন আমি আমার নূতন পুতুলটা নিয়ে খেলা করছি এমন সময় মিস্ সালিভান আমার বড় কাপড়ের পুতুলটাও আমার কোলে রেখে দিলেন এবং "d-o-l-l" কথাটি বানান করে দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, এই একই কথার দ্বারা ঐ দু'টি জিনিসই বোঝায়। এর কিছু পূর্বে "mug" (মগ) ও "water" (জল) এই দু'টি কথা নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে খুব খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়ে গিয়েছিল। মিস্ সালিভান বার বার আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে "m-u-g" বানানের শব্দটির অর্থ মগ এবং "w-a-t-e-r" বানানের শব্দটির অর্থ জল, আমি বার বার ভুল করে দুটির মধ্যে গণ্ডগোল করে ফেলছিলাম। হতাশ হয়ে তিনি তখনকার মত ক্ষান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আবার সুযোগ পাবা মাত্র নূতন করে চেষ্টা শুরু করলেন। তাঁর এই পীড়াপীড়ির ফলে আমি শেষটায় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললাম এবং নূতন পুতুলটা তুলে নিয়ে মেঝের উপর এক আছাড়ে সেটিকে ভেঙে ফেললাম। পায়ের কাছে ভাঙা পুতুলের টুকরাগুলি অনুভব করে আমি ভারী খুসি হয়ে উঠলাম। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে এই কাণ্ডটি করে বসার পর আমার দুঃখ বা অনুতাপ কিছুই হলো না। কারণ পুতুলটিকে আমি মোটেই ভালোবাসতাম না। যে নিস্তব্ধ অন্ধকার রাজ্যে তখন আমি বাস করতাম সেখানে সুগভীর স্নেহমমতা কিংবা অন্য কোন প্রকার মনোবৃত্তির অস্তিত্ব ছিল না। আমি বুঝতে পারলাম, আমার শিক্ষয়িত্রী পুতুলের ভাঙা টুকরাগুলিকে ঝাড়ু দিয়ে চুল্লীর

এক ধারে সরিয়ে রাখলেন ; আমার অশান্তির হেতু অপসারিত হওয়াতে আমি বেশ আনন্দই অনুভব করলাম। তিনি তারপর আমার টুপী নিয়ে এলেন ; বুঝলাম এইবার আমি বাইরের সুমধুর রৌদ্রে বেড়াতে যাব। এই চিন্তা মনে জাগরিত হওয়া মাত্র আমি মনের আনন্দে লাফাতে ও নাচতে আরম্ভ করে দিলাম,—অবশ্য যদি এই রকম একটা বাণীহীন অনুভূতিকে চিন্তা আখ্যা দেওয়া যায়।

আমাদের কুয়াঘরটি হনিসকল্ লতিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল। পথ চলতে চলতে তারই সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কে একজন কুয়া থেকে পাম্প করে জল তুলছিল। শিক্ষয়িত্রী আমার হাতটি নিয়ে কলের মুখের নীচে ধরলেন। শীতল জলস্রোত কল্ কল্ করে আমার এক হাতের উপর পড়তে লাগলো, আর তিনি প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে তাড়াতাড়ি অপর হাতের মধ্যে "water" (জল) কথাটি বানান করে দিতে লাগলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ; আমার সমস্ত মনোযোগ তাঁর অংগুলি সঞ্চালনের উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। সহসা মনে হলো কি একটা ভুলে-যাওয়া জিনিসের অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জেগে উঠছে,—চিন্তাশক্তির প্রত্যাবর্ত্তন জনিত আনন্দ-শিহরণে মন ভরে উঠছে। কেমন করে জানি না, ভাষার রহস্য আমার মনের কাছে সহসা উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, যে সুস্নিগ্ধ শীতল জিনিসটি আমার হাতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে তারই নাম "w-a-t-e-r." ঐ জীবন্ত শব্দটি আমার চিত্তকে জাগরিত করে তুললো, তাকে আলোক, আশা ও আনন্দ প্রদান করলো, তার বন্ধন-মোচন করলো। অবশ্য অনেক অন্তরায় এখনও অবশিষ্ট রইল, কিন্তু কাল-ক্রমে সব অন্তরায়ই ঘুচিয়ে দেওয়া যাবে।

শিখবার জন্য উন্মুখ আগ্রহ নিয়ে আমি কুয়াঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জানতে পারলাম, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা করে নাম আছে ; আর প্রত্যেকটা

নাম থেকে একটা করে নূতন চিন্তার উদ্ভব হতে লাগলো। ঘরে ফিরবার পথে আমি যে যে জিনিস স্পর্শ করি তাতেই যেন জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে লাগলাম। কারণ, তখন আমি এক বিচিত্র, নূতন ধরণের দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছিলাম; তাই দিয়ে সব কিছু দেখছিলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, যে পুতুলটা আমি ভেঙে ফেলেছিলাম তার কথা মনে পড়লো। হাতড়ে হাতড়ে চুল্লীর কাছে গেলাম। ভাঙা টুকরাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু তা তো হবার নয়। আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠলো, কারণ আমি কি অন্যায় করেছি তা তখন বুঝতে পারলাম! জীবনে এই প্রথম আমি সত্যকার দুঃখ ও অনুতাপ অনুভব করলাম।

সেই দিনই আমি আরও অনেক কথা শিখে ফেললাম। সব কথাগুলি আজ আর আমার মনে নেই, তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে তার মধ্যে "বাবা", "মা", "বোন", "শিক্ষয়িত্রী"—এই কথাগুলি ছিল। বাইবেলে বর্ণিত "অ্যারণের হাতের লাঠির মত", আমার জগৎ এই কথাগুলির যাদু-মন্ত্রেই ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল। সেই ঘটনাবহুল দিনটির অবসানে আমি যখন আমার ছোট্ট খাটটিতে শুয়ে দিনের সমস্ত আনন্দময় মুহূর্তগুলির কথা পর্যালোচনা করছিলাম, তখন আমার চেয়ে সুখী আর কোন শিশু দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো না। এই প্রথম আমি নূতন একটি দিনের আগমনের জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করেছিলাম।

পাঁচ

আমার মনের এই আকস্মিক নিদ্রাভঙ্গের পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার অনেকগুলির কথা আমার মনে আছে। আমার হাত দুখানিকে আমি শুধু আবিষ্কার ও সন্ধানের কাজেই ব্যাপৃত রেখে-ছিলাম। যে জিনিসটি আমি স্পর্শ করতাম তৎক্ষণাৎ তার নাম জেনে

নিতাম। যতই আমি হাত দিয়ে জিনিস চিনতে এবং তাদের নাম ও ব্যবহার জেনে নিতে লাগলাম, পৃথিবীর সব কিছুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ ততই বেশী আনন্দময় ও সুদৃঢ় হয়ে উঠতে লাগলো।

যখন ডেইজি ও বাটারকাপ ফুল ফুটবার সময় এসে উপস্থিত হলো, তখন মিস্ সালিভান আমার হাত ধরে মাঠের উপর দিয়ে আমাকে টেনেসী নদীর তীরে নিয়ে যেতেন। মাঠে যখন চাষীরা জমিকে বীজ বপনের উপযুক্ত করে তুলছিল। নদীর ধারে সুখোষ্ণ তৃণভূমির উপর বসে বসে প্রকৃতি দেবীর বদান্যতা সম্বন্ধে আমি প্রথম শিক্ষালাভ করি। আমি জানতে পারলাম, কেমন করে রৌদ্র ও বৃষ্টির ফলে মাটির ভিতর থেকে প্রত্যেকটি গাছ জন্মগ্রহণ করে,– তাদের কোনটি বা দেখতে সুন্দর, কোনটি বা খাদ্য হিসাবে পুষ্টিকর; কেমন করে সমস্ত দেশে পাখিরা বাসা বাঁধে, জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, বংশবৃদ্ধি করে; কেমন করে কাঠবিড়ালী, হরিণ, সিংহ ও অন্যান্য প্রতিটি প্রাণী তাদের আহার ও আশ্রয় সংগ্রহ করে। নানা বস্তু সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতই বাড়তে লাগলো আমার বাসভূমি এই পৃথিবীকে ততই মনোহর বলে মনে হতে লাগলো। পাটিগণিতের অঙ্ক কষতে কিংবা পৃথিবীর আকৃতি বর্ণনা করতে শিখবার বহু পূর্বে মিস্ সালিভান আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সোঁদা সোঁদা গন্ধে ভরা বনে-জঙ্গলে, প্রতিটি তৃণ-পল্লবে, আমার ছোট বোনের সুডৌল টোল-খাওয়া হাত দুখানিতে কি করে সৌন্দর্যের সন্ধান করতে হয়। আমার সর্বপ্রথম চিন্তারাজিকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন, আমাকে অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন যে, "পাখি, ফুল আর আমি,—আমরা সবাই একই আনন্দের অংশীদার।"

কিন্তু এই সময়ে আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার ফলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, প্রকৃতি সব সময়েই মমতাময়ী নয়। একদিন খুব একটা দীর্ঘ ভ্রমণের পর আমি ও আমার শিক্ষয়িত্রী ঘরে ফিরছিলাম। সেদিন

সকালে আবহাওয়া বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু ভ্রমণের শেষে আমরা যখন প্রত্যাবর্তন শুরু করেছি তখন গুমোট হয়ে ক্রমশঃ গরম বাড়তে লাগলো। দু'তিনবার আমরা পথের ধারে গাছতলায় থেমে বিশ্রাম করে নিলাম। শেষবার আমরা আমাদের বাড়ী থেকে একটুখানি দূরে একটা চেরি গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। গাছের ছায়াটি বড় ভালো লাগছিল, তাছাড়া গাছটিতে ওঠাও এত সহজ ছিল যে, শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে হাঁচোড় পাঁচোড় করে গাছের উপরে উঠে ডালপালার মধ্যে এক জায়গায় গিয়ে আমি বসলাম। গাছের উপর এমন চমৎকার ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল যে, মিস্ সালিভান প্রস্তাব করলেন আমরা এইখানে বসেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নেব। আমি কথা দিলাম, চুপ করে বসে থাকবো। তখন তিনি খাবার আনতে বাড়ী চলে গেলেন।

সহসা গাছটি যেন কেমন বদলে গেল। বাতাস থেকে সূর্যের উত্তাপ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আকাশ আঁধার হয়ে উঠেছে। কারণ বায়ুমণ্ডলে উত্তাপের চিহ্নমাত্রও ছিল না, আর তখন উত্তাপের অস্তিত্ব থেকেই আমি আলোর অস্তিত্ব বুঝতে পারতাম। মাটি থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ উঠে আসছিল। এই গন্ধটা আমার চেনা। ঝড়বৃষ্টির ঠিক আগে এই গন্ধটা পাওয়া যায় যেন। একটা অজানা আতংক আমার মনকে অভিভূত করে ফেল'লা। নিজেকে বড় একা মনে হতে লাগলো,—বন্ধু-বান্ধব কেউ কাছে নেই, পায়ের তলায় মাটির সুদৃঢ় আশ্রয়ও নেই। একটা বিশাল অজ্ঞাত রহস্যের অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমি নিশ্চল হয়ে বসে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম; আতঙ্কের হিমস্পর্শে আমার সর্বশরীর নিথর হয়ে উঠলো। একমনে মিস্ সালিভানের প্রত্যাবর্তন কামনা করতে লাগলাম। কিন্তু সেই গাছটা থেকে নেমে পড়বার তাগিদ ছিল তার চেয়েও বেশী।

মুহূর্তকাল ভয়াবহ নিস্তব্ধতার পর গাছের অযুত নিযুত পত্রপল্লবের

মধ্যে চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে উঠলো। সমস্ত গাছটা একবার কেঁপে উঠলো। তারপর বাতাসের এমন প্রবল একটা ঝাপ্‌টা এল যে, প্রাণপণে ডাল আঁকড়ে ধরে বসে না থাকলে ঐ ঝাপ্‌টাতেই আমি নীচে পড়ে যেতাম। ছোট ছোট ডালপালা ভেঙে ঝর্‌ ঝর্‌ করে আমার চারিপাশে ঝড়ে পড়তে লাগলো। পাগলের মত একবার উঠলাম, লাফ দিয়ে পড়ি। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ে আমি নিশ্চল হয়ে গিয়েছিলাম। দুই ডালের ফাঁকের মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইলাম; চারিপাশে বৃক্ষশাখা চাবুকের মত আন্দোলিত হতে লাগলো। মাঝে মাঝে অনুভব করছিলাম গাছটা থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছিল যেন ভারী ভারী কি সব জিনিস পড়ে যাচ্ছে, আর তারই ধাক্কার কাঁপুনি গাছ বেয়ে উঠে আমি যে ডালে বসে আছি সেখানে এসে পৌঁছুচ্ছে। এর ফলে আমার উৎকণ্ঠা তীব্র থেকে তীব্রতম হয়ে উঠছিল। অবশেষে মনে হলো, এইবার গাছও পড়ে যাবে আর তার সঙ্গে আমিও পড়ে যাব। ঠিক এমনি সময় আমার শিক্ষয়িত্রী এসে হাত ধরে আমাকে নীচে নামিয়ে নিলেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম; পায়ের নীচে আবার মাটির স্পর্শ পেয়ে আনন্দে শিউরে শিউরে উঠতে লাগলাম। সেইদিন আমি একটা নূতন শিক্ষা পেলাম। বুঝলাম, "প্রকৃতি তার সন্তান-সন্ততির সঙ্গে খোলাখুলি লড়াই করে, তার কোমলতম স্পর্শের আড়ালে লুকিয়ে থাকে নিষ্ঠুরতম নখর।"

এই অভিজ্ঞতার পর বহুদিন আমি আর কোন গাছে চড়ি নি। গাছে চড়ার চিন্তা করলেই মন আতঙ্কে ভরে উঠতো। একটি ফুলে-ভরা মিমোজা গাছের সুমধুর প্রলোভনে পড়ে অবশেষে আমি এই ভয়কে জয় করি। একদিন এক চমৎকার বসন্ত-প্রভাতে আমি আমাদের উদ্যান-বাটিকায় একা বসে বই পড়ছি, এমন সময় টের পেলাম, বাতাসে একটি অপরূপ মৃদু সুগন্ধি ভেসে আসছে। আমি তখুনি উঠে দাঁড়ালাম এবং সহজাত সংস্কারের বশে

সামনে দুই হাত বাড়িয়ে দিলাম। মনে হলো যেন, বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং উদ্যান-বাটিকার ভিতর দিয়ে উড়ে চলে গেলেন। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "এ কি জিনিস ?" পরমুহূর্তেই চিনতে পারলাম, সিমোজা ফুলের গন্ধ। হাতড়ে হাতড়ে বাগানের প্রান্তে চলে গেলাম। আমি জানতাম, এইখানে, পথটি যেখানে মোড় ঘুরেছে তারই কাছে বেড়ার ধারে সিমোজা গাছটি আছে। হাঁ, ঠিক,—এই তো! করোজ্জ্বল সূর্যকিরণে স্নান করে যেন কাঁপছে, ফুলের ভারে নুয়ে পড়া ডালগুলি নীচের লম্বা ঘাসগুলিকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। পৃথিবীতে পূর্বে কখনও এমন অপূর্ব-সুন্দর আর কোন বস্তু কি কোথাও ছিল? পেলব পুষ্পগুলি যেন মাটির পৃথিবীর সামান্যতম স্পর্শও সসংকোচে এড়িয়ে যেতে চাইছে। এ যেন নন্দন-কাননের গাছ,—সেখান থেকে তুলে এনে এই ধূলির ধরণীতে রোপন করে দেওয়া হয়েছে! ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ির ভিতর দিয়ে এগিয়ে আমি সেই বিশাল গুঁড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক মিনিট একটু ইতস্ততঃ করার পর দুই ডালের মাঝখানকার চওড়া জায়গায় পা দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমি উপরে উঠে গেলাম। ডাল ধরে থাকতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কারণ ডালগুলি ছিল খুব মোটা মোটা আর কর্কশ বক্কলে হাত ছড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু খুব একটা অসাধারণ ও আশ্চর্য ধরণের কিছু করছি এই ভেবে ভারী আনন্দ হচ্ছিল। কাজেই ক্রমশঃ গাছ বেয়ে উপরে উঠে যেতে লাগলাম। অবশেষে গাছের মধ্যে ছোট্ট একটা আসনে এসে পৌঁছুলাম। কে যেন বহুদিন আগে এটাকে তৈরি করে রেখেছিল, কালক্রমে গাছেরই অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। বহুক্ষণ ধরে আমি সেই আসনে বসে রইলাম, মনে হতে লাগলো যেন পরী হয়ে গোলাপ-রঙা মেঘের উপর চড়ে বসে আছি। তারপর আমার সেই নন্দন-কাননের গাছের উপর বসে বসে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মনের আনন্দে কাটিয়ে দিয়েছি; —কত সচ্চিন্তা করেছি, কত সুখস্বপ্ন দেখেছি!

ছয়

সমগ্র ভাষা অধিগত করবার চাবিকাঠিটি এইবার আমার হাতে এসে গিয়েছিল। তার ব্যবহার শিখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। যে শিশুরা কানে শুনতে পায় ভাষা শিক্ষা করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। অপরের মুখ থেকে যে সব কথা খসে পড়ে, মনের আনন্দে তারা সেগুলিকে উড়ন্ত পাখির মত চট্‌পট্‌ ধরে ফেলে। কিন্তু কোন বধির শিশুর পক্ষে কাজটা অত সোজা নয়, অতি ধীরে অতি কষ্টে ফাঁদ পেতে পেতে কথাগুলি তাকে ধরতে হয়। কিন্তু পদ্ধতি যাই হোক, ফল হয় অতি চমৎকার। একটি জিনিসের নামকরণ থেকে আরম্ভ করে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যেতে থাকি ; অবশেষে, আমাদের প্রথম কণ্ঠোচ্চারিত পদাংশগুলি এবং শেক্‌স্‌পীয়রের এক পংক্তি কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ—এই দুইএর মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তাও আমরা অতিক্রম করে যেতে পারি।

প্রথম প্রথম আমার শিক্ষয়িত্রী যখন আমাকে কোন নূতন জিনিসের কথা বলতেন, তখন আমি খুব কম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতাম। তখন আমার ধারণাগুলি অস্পষ্ট ছিল, শব্দের পুঁজিও যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু বস্তু জগৎ সম্বন্ধে যতই আমার জ্ঞান বাড়তে লাগলো, যতই আমি বেশী সংখ্যক কথা শিখতে লাগলাম, ততই আমার জিজ্ঞাসার রাজ্য প্রসার লাভ করতে লাগলো। বার বার আমি একই বিষয়ে ফিরে আসতে লাগলাম, কারণ আমি আরও জানতে চাই, আরও তথ্য আমার জানা দরকার। কখনও কখনও একটা নূতন শব্দ এমন একটা ছবিকে আমার মনের মধ্যে পুনরায় জাগিয়ে তুলতো,

পূর্বজীবনের কোন অভিজ্ঞতার ফলে যা একদা আমার মগজে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল।

যেদিন সকালবেলা আমি জিজ্ঞাসা করি, "ভালোবাসা" কথাটার মানে কি, সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন আমি খুব বেশী কথা জানতাম না। বাগানে আমি কতকগুলি সকালে ফোটা ভায়োলেট ফুল পেয়ে আমার শিক্ষয়িত্রীর জন্য সেগুলি তুলেছিলাম। তিনি আমাকে চুমু খেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মা ছাড়া আর কেউ আমাকে চুমু খায় তখন আমি তা পছন্দ করতাম না। মিস্ সালিভান সস্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার হাতের মধ্যে বানান করে দিলেন, "আমি হেলেনকে ভালোবাসি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ভালোবাসা কাকে বলে?"

তিনি আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে আমার বুকের উপর হাত রেখে বললেন, "ভালোবাসা এইখানে থাকে।" এই প্রথম আমি আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সম্বন্ধে সচেতন হলাম। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর কথাগুলি আমার মনে বেজায় ধোঁকা লাগিয়ে দিল, কারণ সে সময়ে স্পর্শ না করে আমি কোন জিনিস বুঝতে পারতাম না।

তাঁর হাতের ভায়োলেটগুলির আঘ্রাণ নিয়ে অর্ধেক আকারে-ইঙ্গিতে অর্ধেক কথার সাহায্যে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। প্রশ্নটির মর্মার্থ হলো এই: "ফুলের সুমিষ্ট গন্ধই কি ভালোবাসা?"

তিনি বললেন, "না।"

আবার আমি ভাবতে লাগলাম। সূর্যের মধুর উষ্ণ কিরণ তখন আমাদের উপর এসে পড়েছিল।

যে দিক থেকে উষ্ণতা অনুভব করছিলাম সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রশ্ন করলাম, "ভালোবাসা কি এই জিনিস নয়?"

আমার মনে হলো, সূর্যের চেয়ে বেশী সুন্দর আর কোন জিনিস হতে

পারে না, কারণ সূর্যের উত্তাপেই সব জিনিস বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু মিস্ সালিভান মাথা নেড়ে জানালেন, "না।" আমি অতিমাত্রায় হতবুদ্ধি ও হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার শিক্ষয়িত্রী আমাকে ভালোবাসা দেখাতে পারলেন না, এ আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত বলে মনে হলো।

এর দুই একদিন পরে ছোট বড় নানা আকারের কতকগুলি পুঁতি নিয়ে আমি সেগুলিকে সুবিন্যস্ত সমষ্টি অনুযায়ী সাজিয়ে সাজিয়ে সুতো দিয়ে মালা গাঁথছিলাম;—দুটি বড় পুঁতির পর তিনটি ছোট পুঁতি, তারপর আবার দুটি বড় পুঁতি, এই রকম। আমি বার বার ভুল করছিলাম, সুমধুর ধৈর্যের সঙ্গে মিস্ সালিভান বার বার আমার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। অবশেষে আমি আবিষ্কার করলাম যে, পুঁতি সাজানোর মধ্যে আমি বেশ স্পষ্ট একটা ভুল করে ফেলেছি। এক মুহূর্তের জন্য আমি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করতে লাগলাম, চিন্তা করতে লাগলাম, পুঁতিগুলি কি ভাবে সাজানো আমার উচিত ছিল। ঠিক এই সময়ে মিস্ সালিভান আমার কপাল স্পর্শ করলেন এবং বেশ জোরের সঙ্গে বানান করে দিলেন, "চিন্তা"।

যেন বিদ্যুচ্চমকের মত আমি বুঝতে পারলাম, আমার মাথার মধ্যে যে প্রক্রিয়াটি চলছিল, এই কথাটি তারই নাম। এই প্রথম আমি সচেতন ভাবে একটা বস্তুনিরপেক্ষ ধারণার কথা বুঝতে পারলাম।

বহুক্ষণ ধরে আমি নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। কোলের উপর পুঁতিগুলি পড়ে ছিল, কিন্তু তাদের কথা আমি ভাবছিলাম না। এই নূতন ধারণার সাহায্যে আমি "ভালোবাসা" কথাটির অর্থ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলাম। সেদিন সর্বক্ষণ সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা ছিল; ছোট ছোট কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সহসা দক্ষিণাঞ্চল সুলভ দীপ্তির গরিমায় উদ্‌ভাসিত হয়ে সূর্যদেব আকাশে আবির্ভূত হলেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এই কি ভালোবাসা নয়?"

তিনি উত্তর দিলেন, "সূর্য দেখা দেবার আগে আকাশে যে সব মেঘ ছিল, ভালোবাসা অনেকটা সেই ধরণের জিনিস।" তারপর তিনি কথাটা বুঝিয়ে দিলেন : "দেখ, মেঘগুলোকে তুমি ছুঁতে পার না, কিন্তু মেঘ থেকে যে বৃষ্টি পড়ে তা তুমি অনুভব করতে পার। সমস্ত দিনের গরমের পর বৃষ্টি হলে ফুলগুলো আর তৃষ্ণার্ত পৃথিবী যে কত খুসি হয়ে ওঠে তাও তুমি জান। ভালোবাসাকেও তুমি স্পর্শ করতে পার না, কিন্তু ভালোবাসা থেকে যে মাধুর্যের ধারা সব জিনিসের ওপর ঝরে পড়ে তা তুমি অনুভব করতে পার। ভালবাসা না থাকলে তোমার মনে কোন আনন্দ থাকতো না, তুমি খেলা করতেও চাইতে না।"—অবশ্য তিনি কথাগুলিকে আরও অনেক সোজা করে বলেছিলেন, কারণ এ সব কথা বোঝা তখন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সহসা এই পরম সুন্দর মহাসত্য আমার মনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। অনুভব করলাম, আমার হৃদয় ও অপর সকলের হৃদয়ের মধ্যে বহু অদৃশ্য যোগসূত্র বিরাজ করছে।

আমার শিক্ষার প্রারম্ভ থেকেই মিস্ সালিভান এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতেন, যেন তিনি কোন শ্রুতিশক্তিশালী শিশুর সঙ্গে কথা বলছেন। পার্থক্যের মধ্যে মাত্র এই ছিল যে, মুখে কথা বলার পরিবর্তে তিনি আমার হাতের মধ্যে বাক্যগুলি বানান করে দিতেন। ভাব প্রকাশের উপযোগী কথা ও বাগ্‌ভঙ্গি যদি আমি খুঁজে না পেতাম, তাহলে তিনিই সেগুলি জুগিয়ে দিতেন। এমন কি আমাদের দুজনের কথাবার্তার সময়ে আমার বক্তব্য যদি আমি বলতে না পারতাম, তাহলে আমার কি বলা উচিত সেকথাও তিনি আমাকে শিখিয়ে দিতেন।

কয়েক বছর ধরে এই পদ্ধতিতে কাজ চলতে লাগলো; কারণ আমাদের

সহজতম দৈনন্দিন আলাপ আলোচনায় আমরা যে অসংখ্য বাক্যরীতি ও বাগভঙ্গি ব্যবহার করে থাকি, কোন বধির শিশুর পক্ষে এক মাসে, এমন কি দুই তিন বৎসরেও সেগুলি সব অধিগত করে নেওয়া অসম্ভব। যে ছোট্ট শিশুটি কানে শুনতে পায় সে এগুলি শিখে ফেলতে পারে বারংবার পুনরাবৃত্তি ও অনুকরণের ফলে। নিজের ঘরে সে যেসব আলাপ আলোচনা শুনতে পায় তা থেকে তার মন উৎসাহ সঞ্চয় করে, অন্যান্য নানা বিষয়-বস্তুর আভাস পায়, এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের চিন্তারাজিকে ভাষায় ব্যক্ত করবার প্রেরণা লাভ করে ভাবের এই স্বাভাবিক আদান-প্রদান বধির শিশুর নাগালের বাইরে। আমার শিক্ষয়িত্রী এটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যে প্রেরণার আমার অভাব ছিল তিনি নিজেই তা আমাকে জুগিয়ে দেবেন মনস্থ করলেন। কাজটা তিনি করতেন এই ভাবে: তিনি যা কিছু শুনতে পেতেন সবই যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন, এবং কি করে আমি কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করতে পারি তাও আমাকে দেখিয়ে দিতেন। কিন্তু নিজে থেকে কারও সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করবার মত সাহস সংগ্রহ করতে আমার বহুদিন লেগেছিল; আর তার চেয়েও বেশীদিন লেগেছিল উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথা খুঁজে পাবার ক্ষমতা অর্জন করতে।

যারা বধির কিংবা যারা অন্ধ তাদের পক্ষে আলাপ-আলোচনা থেকে আনন্দ আহরণ করা বড় কঠিন কাজ। সুতরাং যারা অন্ধ ও বধির দুইই তাদের পক্ষে কাজটা যে কতগুণ বেশী তা সহজেই অনুমান করা যায়। তারা বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সুরের তফাৎ বুঝতে পারে না, এবং নিজেরাও অপরের সাহায্য ব্যাতিরেকে গলার সুর চড়াতে বা নামাতে পারে না। অথচ এই সুরের খেলাই মুখের কথার তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা যোগায়। বক্তার মুখভাব লক্ষ্য করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ অনেক সময় চোখের একটা চাউনি মাত্র বক্তব্যের অন্তরতম অর্থ প্রকাশ করে দেয়।

সাত

এরপর আমি আমার শিক্ষার পথে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। আমি পড়তে শিখলাম।

কয়েকটি কথার বানান শিখে শেষ করার পরেই আমার শিক্ষয়িত্রী আমাকে কতকগুলি পিসবোর্ডের টুকরা দিলেন। এগুলির উপর উঁচু উঁচু অক্ষরে ছাপানো কতকগুলি কথা ছিল। আমি শীঘ্রই বুঝে ফেললাম যে প্রত্যেকটি ছাপানো কথার অর্থ হয় একটা জিনিস, না হয় একটা কাজ, আর না হয়তো একটা গুণ। আমার একটা ফ্রেম ছিল। এতে আমি কথা সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট ছোট বাক্য তৈরি করতে পারতাম। কিন্তু ফ্রেমে বাক্য রচনার আগেই আমি জিনিস দিয়ে বাক্যরচনা আরম্ভ করেছিলাম। মনে করুন, আমি চার টুকরা কাগজ বেছে নিলাম, তার উপর ছাপা আছে "পুতুল", "হয়", "বিছানা" আর "উপরে"। প্রথমে নাম দু'টি জিনিস দুটির উপর রাখলাম; তারপর পুতুলটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে "হয়", "বিছানা" আর "উপরে" —এই তিনটি কথা তার পাশে সাজিয়ে রাখলাম। এতে একটা বাক্য রচনা করাও হলো, আবার জিনিসগুলি দিয়ে বাক্যের অর্থটাও বুঝিয়ে দেওয়া হলো।

মিস্ সালিভান আমাকে বলেছেন, আমি নাকি একবার "বালিকা"—এই কথাটা সেফটিপিন দিয়ে আমার বহির্বাসে এঁটে দিয়ে পোষাকের আলমারির মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম, আর তাকের উপর "হয়", "আলমারি", "ভিতরে" এই তিনটি কথা সাজিয়ে রেখেছিলাম। এই খেলায় আমি যত মজা পেতাম এমন আর কিছুতেই পেতাম না। আমি ও আমার শিক্ষয়িত্রী

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই খেলা খেলতাম। অনেক সময় এমন হতো যে, ঘরের সমস্ত মালপত্র আমরা এমনি জিনিস দিয়ে গড়া রচনা করে কাজে সাজিয়ে ফেলতাম।

ছাপানো কাগজের টুকরো থেকে ছাপানো বই-এ চলে যেতে বেশী দিন লাগলো না। আমার "প্রথম পাঠ"-খানি হাতে নিয়েই আমি চেনা কথার খোঁজ করতে লাগলাম; আর সেগুলিকে যখন আমি খুঁজে পেলাম তখন আমার সে কি আনন্দ! যেন লুকোচুরি খেলা করছি! এমনি ভাবে আমি পড়তে শুরু করলাম। যে সময়ে আমি ধারাবাহিক গল্প পড়তে আরম্ভ করি তার কথা পরে বলবো।

বহুদিন আমি কোন রকম নিয়মিত পড়াশুনা করি নি। যখন একাগ্রতার সঙ্গে পাঠাভ্যাস করতাম, তখন মনে হতো না কোন কাজ করছি, মনে হতো যেন খেলা করছি। মিস্ সালিভান আমাকে যখন যা শেখাতেন, হয় একটা সুন্দর কবিতা না হয় একটা চমৎকার গল্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে তা বুঝিয়ে দিতেন। যখনই কোন জিনিস দেখে আমি আনন্দ বা কৌতূহল অনুভব করতাম, তখনই তিনি তাই দিয়ে এমন ভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিতেন যেন তিনিও আমার মত একটি ছোট্ট বালিকা। যে শিক্ষার কথা মনে হলেই অনেক শিশু ভয় পায়, যাকে তারা ব্যাকরণের বিরক্তিকর কচকচি, শক্ত শক্ত অঙ্ক কষা এবং আরও শক্ত শক্ত সংজ্ঞা মুখস্থ করা মাত্র বলে মনে করে, সেই শিক্ষার কথাই আজ আমার স্মৃতি-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন হয়ে আছে।

আমার সমস্ত আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষাকে মিস্ সালিভান যে অসাধারণ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতেন তা আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। বোধ হয় অন্ধদের সঙ্গে দীর্ঘকালস্থায়ী সাহচর্যের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। অধিকন্তু, তাঁর বর্ণনা ক্ষমতা ছিল অসামান্য। অপ্রীতিকর

খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তিনি কখনও বেশী কালক্ষেপ করতেন না। গত পরশুর পড়া আমার মনে আছে কি না তাই পরীক্ষা করবার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে আমাকে তিতোবিরক্তও করে তুলতেন না। বিজ্ঞানের নীরস যান্ত্রিক তথ্যাবলী তিনি একটু একটু করে আমাকে শিখিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয় তিনি এত জীবন্ত করে তুলতে পারতেন যে, তিনি যা শেখাতেন তা আমি আর কিছুতেই ভুলতে পারতাম না।

আমরা বাড়ীর বাইরে গিয়ে পড়াশুনো করতাম। ঘরের চাইতে সূর্য-করোজ্জ্বল বনভূমি আমাদের বেশী ভালো লাগতো। আমার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে বনের গন্ধ মিশে আছে,—পাইন-পাতার সুমধুর ধুনো-ধুনো গন্ধ, আর তার সঙ্গে সংমিশ্রিত বুনো আঙুরের সৌরভ। একটা বন্য টুলিপ্ গাছের সুশীতল ছায়ায় বসে বসে আমি চিন্তা করতে শিখে-ছিলাম যে, প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের কিছু শিক্ষা দিতে পারে, আমাদের মনে কোন ব্যঞ্জনা জাগাতে পারে। "সমস্ত জিনিসের সৌন্দর্যই আমাকে তাদের উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল।" যা কিছু গুঞ্জন করতে পারে, ভন্ ভন্ করতে পারে, গান গাইতে পারে বা পুষ্পিত হয়ে উঠতে পারে—উচ্চকণ্ঠ ব্যাঙের দল, ঝিঁঝিঁপোকা ও উচ্চিংড়ে, কোমলস্পর্শ মুরগীর বাচ্চা ও বুনো ফুল, ডগ্‌উড্ ও মেড়ো-ভায়োলেট ফুল, ফুলের কুঁড়িতে ছাওয়া ফলের গাছ,—সবই আমাকে শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ করেছিল। এই ঝিঁঝিঁপোকা ও উচ্চিংড়েগুলোকে আমি হাতে ধরে রাখতাম ; কিছুক্ষণ পরেই তারা নিজেদের সঙ্কটের কথা ভুলে মধুর সুরের নিক্কণ শুরু করে দিত। তুলোর ফলগুলি ফাটবার সময় আমি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতাম, তাদের নরম তন্তু ও আঁশওয়ালা বীজগুলিকে পরীক্ষা করে দেখতাম। ভুট্টাগাছের ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের চাপা দীর্ঘশ্বাস, লম্বা লম্বা পাতাগুলির মৃদু-মধুর খস্‌খস্-

ধ্বনি, চারণক্ষেত্র থেকে ধরে এনে মুখে লাগাম পরানোর সময় আমার টাট্টুঘোড়াটির ক্রুদ্ধ ফোঁস্‌ফোঁসানি,—সবই আমি অনুভব করতাম। আঃ! সেই ঘোড়ার নিশ্বাসে আমি যে ঝাঁঝালো ঘাস-ঘাস গন্ধ পেতাম, তার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

কোন কোন দিন আমি ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে চুপি চুপি বাগানে চলে যেতাম। তখন সমস্ত ঘাস ও ফুলের উপর পুরু হয়ে শিশির পড়ে থাকতো। হাতের মধ্যে গোলাপফুলের কোমল স্পর্শ কিংবা প্রভাত-সমীরণে দোদুল্যমান লিলি ফুলের অপরূপ চাঞ্চল্য—এর মধ্যে যে কি আনন্দ নিহিত আছে ক'জন তা জানে? কখনও কখনও ফুল তুলতে গিয়ে আমি হয়তো একটা পোকা ধরে ফেলতাম। বাইরে থেকে একটা চাপ খেয়ে ক্ষুদ্র পতঙ্গটি যখন সহসা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে এক জোড়া পাখা পরস্পরের সঙ্গে ঘসতে আরম্ভ করতো, তখন তার সেই অতিক্ষীণ ধ্বনিটুকুও আমি অনুভব করতে পারতাম।

আর একটা জায়গায় যেতে আমি বড় ভালোবাসতাম। সেটি হচ্ছে আমাদের ফলের বাগান। জুলাই মাসের প্রথম দিকে বাগানে ফল পাকতো। নরম রোঁয়ায় ঢাকা বড় বড় পিচ্‌ ফলগুলি ঝুলে নীচু হয়ে আমার হাতের নাগালের মধ্যে এসে পড়তো। গাছে গাছে হাওয়া মনের আনন্দে হুটোপাটি করে বেড়াতো, আর আমার পায়ের কাছে টপ্‌ টপ্‌ করে আপেলের পর আপেল পড়তো। ওঃ! সে কি আনন্দ! ফল কুড়িয়ে বহির্বাসের আঁচল ভরে ফেলতাম; কখনও রৌদ্রতপ্ত আপেলগুলির মসৃণ গায়ে মুখ চেপে ধরতাম; তারপর নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে আসতাম।

"কেলার্স্‌ ওয়াক" নামে টেনেসী নদীর উপর অবস্থিত একটা পুরানো ভাঙাচোরা কাঠের তৈরি জেটির উপর গিয়ে বেড়াতে আমরা বড় ভালো-বাসতাম। গৃহযুদ্ধের সময় এই জেটিতে সৈন্য এনে নামানো হতো।

এইখানে আমরা ভূগোল শেখার খেলা খেলে মনের আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি দিয়ে আমি বাঁধ গড়তাম, দ্বীপ আর হ্রদ তৈরী করতাম, মাটি খুঁড়ে নদীর খাত নির্মাণ করতাম। সবই মজার খেলা; স্বপ্নেও মনে হতো না যে আমি লেখাপড়া করছি। মিস্ সালিভান যখন এই বিরাট পৃথ্বী গোলকের বর্ণনা করতেন, তার প্রজ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি মাটি-চাপা-পড়া বড় বড় নগরী, প্রবহমান তুষারনদী এবং এই রকম আরও নানা আশ্চর্য জিনিসের কথা বলতেন, তখন আমি ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনতাম। মাটি দিয়ে উঁচু উঁচু করে তিনি মানচিত্র গড়ে দিতেন; সুতরাং পর্বত শিখর ও উপত্যকাগুলি আমি হাত দিয়ে অনুভব করতে পারতাম, আঙুল দিয়ে নদনদীর ধারাগুলি অনুসরণ করতে পারতাম। এও আমার বেশ ভালো লাগতো। কিন্তু পৃথিবীর মেরু ও মণ্ডলের বিভাগগুলি আমার মনকে বিভ্রান্ত ও উত্ত্যক্ত করে তুলতো। যে সুতোগুলি দিয়ে আমাকে মণ্ডল বোঝানো হতো এবং এফোঁড় ওফোঁড় করে কমলানেবুতে বেঁধানো যে কাঠিটির সাহায্যে মেরুপ্রদেশের অবস্থান বোঝানো হতো সেগুলি এত বাস্তব বলে মনে হতো যে, এখনও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নাম করলেই সুতো দিয়ে তৈরি কতকগুলি বৃত্তের কথা আমার মনে পড়ে। আর এখনও কেউ যদি চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চয় আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে শ্বেত-ভল্লুকেরা সত্য সত্যই উত্তর মেরুতে "আরোহণ" করে থাকে।

যতদূর মনে আছে একমাত্র পাটিগণিত শিখতে আমার মোটেই ভালো লাগতো না। গোড়া থেকেই সংখ্যাবিজ্ঞানের মধ্যে আমি কোন রস পেতাম না। গুচ্ছে গুচ্ছে নির্দিষ্ট-সংখ্যক পুঁতিতে সুতো পরানোর সাহায্যে মিস্ সালিভান আমাকে গুনতে শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিণ্ডার গার্টেনে ব্যবহৃত খড়ের কুটো সাজিয়ে সাজিয়ে আমি যোগ-বিয়োগ শিখেছিলাম। কিন্তু এক সময়ে পাঁচটি বা ছ'টির বেশী স্তূপ সাজানোর ধৈর্য আমার থাকতো না

এই পর্যন্ত করা হলেই সারাদিনের মত কর্তব্যবোধের অবসান হতো। তখন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তাম খেলার সাথীদের সন্ধানে।

এই একই রকম ধীর সুস্থে আমি প্রাণি-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলাম।

একবার একজন ভদ্রলোক—তাঁর নাম আমি ভুলে গেছি—আমাকে কতকগুলি জীবাশ্ম (fossil) সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল সুন্দর সুন্দর নক্সাকাটা ঝিনুক, পাখির পায়ের ছাপ-লাগানো কয়েক টুকরা বেলে পাথর এবং উৎকীর্ণ শিলাচিত্রের মত একটি চমৎকার ফার্ণ্ গাছ। এই চাবিগুলির সাহায্যেই আমার সামনে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সে সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জানোয়ার—এমন তাদের বিট্কেল নাম যে উচ্চারণ পর্যন্ত করা যায় না—একদা আদিম অরণ্যভূমি তোলপাড় করে ঘুরে বেড়াতো, বিশাল বিশাল বনস্পতির ডাল ভেঙে চিবিয়ে খেত, আর সেই অজ্ঞাত যুগের ভয়াবহ জলাভূমিগুলোর মধ্যে প্রাণত্যাগ করতো, তাদের কথা মিস্ সালিভান যখন বর্ণনা করতেন, শুনতে শুনতে উত্তেজনায় আমার হাতের আঙুল কাঁপতে থাকতো। বহুদিন ধরে এই অদ্ভুত জানোয়ারগুলো আমার স্বপ্নের মধ্যে ঘোরাফেরা করতো। বর্তমান ছিল আনন্দময় কাল, সূর্যকিরণ ও গোলাপ ফুলে পরিপূর্ণ, আমার টাট্টুঘোড়ার মৃদু পদশব্দের প্রতিধ্বনিমুখর। কিন্তু তার পিছনে ঘনকৃষ্ণ পশ্চাৎপটের মত বিরাজ করতো এই প্রাচীন নিরানন্দ যুগের ছবি।

আর একবার আমি একটা সুন্দর শামুক উপহার পেয়েছিলাম। যখন আমি জানতে পারলাম যে, একটি অতিক্ষুদ্র কম্বোজ কীট (mollusk) তার বাসস্থান হিসাবে এই সমুজ্জ্বল কুণ্ডলীটিকে তৈরি করেছিল, এবং নিস্তব্ধ নিশীথে বায়ুহীন নিস্তরঙ্গ ভারত মহাসাগরের সুনীল জলরাশির উপর নটিলাস শামুক তার "মুক্তাশুভ্র জাহাজে" পাল তুলে দিয়ে ভেসে

বেড়ায়,—তখন আমার শিশুহৃদয় বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর পরে আমি সমুদ্র-নিবাসী জীবজন্তুর জীবন ও ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছিলাম :—জানতে পেরেছিলাম কি করে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল কীট সুন্দর সুন্দর প্রবাল-দ্বীপ নির্মাণ করে, কি করে বহুদেশে ফোরামিনিফেরা কীটের দল খড়ির পাহাড় গড়ে তোলে। এরও পরে আমার শিক্ষয়িত্রী আমাকে The Chambered Nautilus নামক কবিতাটি পড়ে শোনান এবং বুঝিয়ে দেন যে, কম্বোজকীটের দেহাবরণ গড়বার প্রক্রিয়াটিকে মানব মনের পরিপুষ্টি সাধনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। নটিলাস্ শামুকের বিচিত্র শক্তিশালী ছাঁকনি যন্ত্রটি যেমন ভাবে জল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তাকে আপন শরীরে অঙ্গীভূত করে ফেলে, ঠিক তেমনি ভাবে মানুষের দ্বারা সংগৃহীত নানা টুকরা টুকরা জ্ঞান রূপান্তর গ্রহণ করে চিন্তার মুক্তাবলীতে পরিণত হয়।

আর একবার একটা উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ থেকে শিক্ষণীয় বস্তু লাভ করেছিলাম। আমরা একটা লিলি ফুলের গাছ কিনে সেটিকে জানালার উপর রৌদ্রে রেখে দিলাম। শীঘ্রই তার সবুজ সূক্ষ্মাগ্র কুঁড়িগুলিতে বিকশিত হবার লক্ষণ দেখা গেল। বাইরের সরু সরু আঙুলের মত আবরণগুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে লাগলো। আমার মনে হলো, যেন ফুলের গোপন সৌন্দর্যটুকু প্রকাশিত করতে তাদের বড়ই অনিচ্ছা। একবার আরম্ভ হয়ে যাবার পর উন্মীলন প্রক্রিয়াটি বেশ দ্রুতই চলতে লাগলো,—কিন্তু অতি সুশৃঙ্খলতার, একটির পর একটি করে। সব সময় দেখা যেত, একটি কুঁড়ি আর সমস্তগুলির চেয়ে বৃহত্তর ও বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছে, অনেক বেশী ঘটা করে বহিরাবরণ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে। এই সুকোমল রেশমী পোশাকপরা ফুলকুমারী যেন বুঝতে

পারতো, ভগবানের দেওয়া অধিকারের দাবীতে আজ সে লিলিফুলের রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। এদিকে তার অন্যান্য লাজুক বোনেরা অতি সন্তর্পণে মাথার সবুজ ঘোমটাগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলতো। অবশেষে সমস্ত গাছটি মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে একটি পল্লবের মত হাওয়ায় দুলতে থাকতো।

একবার নানা গাছপালায় ভরা একটা জানালার উপর একটা কাচের গোলকের মধ্যে এগারটা ব্যাঙাচি রেখে দেওয়া হয়েছিল। কি আগ্রহের সঙ্গে যে আমি এদের সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করতাম তা আমার এখনও মনে আছে। পাত্রটির জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে আমি অনুভব করতাম ব্যাঙাচিগুলি নেচে বেড়াচ্ছে, আমার আঙুলের মজা লাগতো। এদের মধ্যে একটার বোধ হয় একটু বেশী উচ্চাভিলাষ ছিল। সে একদিন লাফ দিয়ে পাত্রের কানা ডিঙিয়ে মাটিতে এসে পড়লো। আমি যখন তাকে খুঁজে পেলাম, তখন তার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জীবনের একমাত্র চিহ্ন স্বরূপ লেজটি তখনও একটু একটু নড়ছে। কিন্তু জলের মধ্যে ফিরে যাবা মাত্রই সে এক ডুবে পাত্রের তলায় চলে গেল, তারপর আনন্দ চঞ্চল হয়ে ঘুরে ঘুরে সাঁতরে বেড়াতে লাগলো। তার লম্ফাভিযান সম্পূর্ণ হয়েছে, বাইরের বিশাল পৃথিবী তার দেখা হয়ে গেছে। অতঃপর, পূর্ণবয়স্ক সাবালক ব্যাঙে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত, প্রকাণ্ড ফিউশা গাছের ছায়ায় বসানো তার সেই মনোরম কাচকক্ষটির মধ্যে সে মনের সুখেই বাস করেছিল। তারপর সে বাগানের প্রান্তে অবস্থিত গাছের পাতায় ছাওয়া জলাশয়টিতে বাস করতে চলে যায়। সেইখান থেকে তার অদ্ভুত প্রেম-সঙ্গীত গেয়ে কত গ্রীষ্মরজনীকে সে সুরে সুরে মুখর করে তুলতো।

এমনি করে জীবন থেকেই আমি শিক্ষালাভ করতাম। প্রথমে আমি ছিলাম নানা সম্ভাবনার একটি ক্ষুদ্র সমষ্টি মাত্র। আমার শিক্ষয়িত্রীই

এই সব সম্ভাবনাকে বাইরে টেনে এনে মূর্ত করে তুলেছিলেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার চারিদিকে প্রেম ও আনন্দের সমীরণ প্রবাহিত হয়েছিল, সব কিছু সার্থক হয়ে উঠেছিল। তারপর থেকে, প্রতি পদার্থের মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত আছে তা আমাকে দেখিয়ে দেবার একটি সুযোগও তিনি কখনও অবহেলা করেন নি। চিন্তা, কার্য ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার জীবনকে মধুর ও হিতকর করে তুলবার প্রচেষ্টায় তিনি কখনও ক্লান্ত হন নি।

আমার শিক্ষয়িত্রীর প্রতিভা, তাঁর ক্ষিপ্র সহানুভূতি, তাঁর সপ্রেম বিবেচনাশক্তি—এই সবই আমার শিক্ষা-জীবনের প্রথম বৎসর কয়টিকে এত রমনীয় করে তুলেছিল। জ্ঞান বিতরণের ঠিক উপযুক্ত মুহূর্তটি তিনি খুঁজে বার করতে পারতেন বলেই আমি তা এত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতাম। তিনি বুঝতেন যে, শিশুর মন স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিণীর মত,—শিক্ষার শৈলবন্ধুর পথ বেয়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে মনের খুসীতে নেচে চলে যায়; কোথাও বা একটি ফুল, কোথাও বা একটি গাছের ঝোপ, কোথাও বা এক টুকরা পশমী মেঘ তার বুকে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি আমার মনের স্রোতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাইতেন; জানতেন যে, জলস্রোতের মত পার্বত্য নির্ঝরিণী ও মাটির গোপন উৎস দুই থেকেই এর পুষ্টি সাধন হওয়া উচিত। তবেই এই মন বিস্তার লাভ করে সুগভীর নদীতে পরিণত হয়; তবেই এর প্রশান্ত কক্ষে তরঙ্গায়িত গিরিশ্রেণী, গাছপালা ও আকাশের সমুজ্জ্বল ছবি ও ছোট্ট একটি ফুলের মধুর মুখখানি সমানভাবে প্রতিবিম্বিত হতে পারবে।

শিক্ষকের পক্ষে শিশুকে স্কুলের ক্লাসে নিয়ে যাওয়া খুবই সহজ, কিন্তু তাকে শিক্ষা দেওয়া সকল শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। শিশু যদি বুঝতে না পারে যে, কাজের সময়েই হোক আর বিশ্রামের সময়েই হোক, সে সম্পূর্ণ

স্বাধীন, তাহলে সে কাজের মধ্যে কোন আনন্দ পায় না। প্রথমে তাকে জয়লাভের গৌরব ও পরাজয়ের হতাশা অনুভব করতে দিতে হবে। তা হলেই সে, যে সব কাজ তার কাছে অপ্রীতিকর মনে হয়, তাও করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে, পাঠ্যপুস্তক সমাকীর্ণ নীরস কর্মধারার মধ্য দিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যাবার দৃঢ়সঙ্কল্পে অটল হয়ে উঠবে।

আমার শিক্ষয়িত্রীকে আমার এত কাছের মানুষ বলে মনে হয় যে, তাঁকে বাদ দিয়ে নিজের কথা আমি ভাবতেই পারি না। সমস্ত সুন্দর জিনিসের মধ্যে আমি যে আনন্দের সন্ধান পাই, তার কতখানি আমার নিজস্ব আর কতখানি তাঁর প্রভাব-সম্ভূত, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি মনে প্রাণে অনুভব করি, তাঁর অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব অভিন্ন,—আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁরই পদক্ষেপ ধ্বনিত হয়ে উঠছে। আমার মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে ভালো সবই তাঁর দান; আমার মধ্যে এমন কোন গুণ, এমন কোন আকাঙ্ক্ষা, এমন কোন আনন্দ নেই যা তাঁরই সস্নেহ স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি।

আট

মিস্ সালিভান টাস্কাম্বিয়ায় আসার পর প্রথম বড়দিনের উৎসবটি আমার জীবনের একটা মস্তবড় ঘটনা। পরিবারের সকলেই আমাকে অবাক করে দেবার জন্য তোড়জোড় করছিলেন, কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, মিস্ সালিভান এবং আমিও আর সবাইকে অবাক করে দেবার উদ্যোগ করছি। উপহারগুলিকে যে একটা রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছিল তার ফলে আমার স্ফূর্তি ও আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না।

বন্ধুরা আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন; ইঙ্গিত ইশারার সাহায্য নিচ্ছিলেন, হয়তো বা একটা বাক্য বানান করতে আরম্ভ করে মাঝামাঝি এসে ঠিক সময়টিতে থেমে যাবার ভান করছিলেন। মিস্ সালিভান ও আমি একটা অনুমান করার খেলা বানিয়ে যেতে লাগলাম। এর ফলে ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখে ফেললাম; বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়ে এতটা হতে পারতো না। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা জলন্ত কাঠের বহ্নিকুণ্ডের চারি পাশে বসে আমরা এই অনুমানের খেলা খেলতাম। বড়দিন যত কাছে এসে পড়তে লাগলো তাই আমাদের খেলার উত্তেজনাও বাড়তে লাগলো।

বড়দিনের আগের দিন টাস্কাম্বিয়া স্কুলের ছেলেমেয়েদের 'ক্রিস্‌মাস্ বৃক্ষ'টি এসে পৌঁছুল। তারা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালো। স্কুল ঘরের ঠিক মাঝখানে সুন্দর বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে; মৃদু আলোকে ঝলমল্ করছে, যেন তার পাতায় পাতায় আগুন ধরে গেছে; বিচিত্র বিস্ময়কর ফলে ফলে তার শাখা-প্রশাখা বোঝাই। আমার সে এক অতুলনীয় আনন্দের মুহূর্ত। আবেগে আত্মহারা হয়ে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে বৃক্ষটির চারদিকে ঘুরতে লাগলাম। যখন আমি জানতে পারলাম যে, প্রত্যেক শিশু একটি করে উপহার পাবে, আর যে সব মহানুভব ব্যক্তি এই বৃক্ষটি তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অনুমতিক্রমে আমিই উপহার বিতরণ করবো, তখন আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম। উপহার বিতরণের আনন্দে নিজে কি উপহার পেলাম তা দেখবার অবসর আমার হয় নি। কিন্তু যখন অবশেষে আমার অবসর হলো, তখন সত্যকার বড়দিন কখন আরম্ভ হবে ভাবতে গিয়ে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হলো। আমি জানতাম, আমি এর মধ্যেই যে সব উপহার পেয়েছি আমার বন্ধুরা সেগুলি সম্বন্ধে তাঁদের সেই সব কৌতূহলোদ্দীপক ইশারা-ইঙ্গিত প্রদান করেন নি। আমার শিক্ষয়িত্রীও বললেন, আমি পরে

এর চাইতে আরও অনেক ভালো ভালো উপহার পাব। যাহোক আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে 'ক্রিসমাস বৃক্ষ' থেকে যে উপহারগুলি পেয়েছিলাম তাই নিয়ে রাতের মত খুসি থাকতে রাজি করা হলো। বলা হলো, আর সব উপহার আমি পরদিন সকালে পাব।

মোজা ঝুলিয়ে দেবার পর সেদিন রাত্রে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে ছিলাম। ঘুমোবার ভান করে সতর্ক ও উৎকর্ণ হয়ে রইলাম; উদ্দেশ্য, স্যাণ্টা ক্লজ এসে কি করেন দেখবো। অবশেষে একটা নূতন পুতুল ও একটা শাদা ভালুক কোলে নিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন প্রভাতে আমিই বাড়ীর সকলকে জাগিয়ে তুললাম আমার প্রথম "শুভ বড়দিন!" ধ্বনি দিয়ে। আমাকে অবাক করে দেবার মত নানা উপহার আমি খুঁজে পেলাম,—শুধু আমার মোজার মধ্যে নয়, টেবিলের উপর, চেয়ারের উপর, দরজার কাছে, এমন কি জানালার তাকের উপর পর্যন্ত। টিস্যু পেপারে জড়ানো বড়দিনের অসংখ্য টুকরা যেন সারা বাড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে, চলতে গেলেই হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু যখন আমার শিক্ষয়িত্রী আমাকে একটা ক্যানারি পাখি উপহার দিলেন, তখন আমার পরিপূর্ণ খুসির পেয়ালা যেন কানা ছাপিয়ে উপচে পড়লো।

এই ছোট্ট ক্যানারি পাখিটির নাম ছিল টিম্। সে এমন পোষ মেনেছিল যে লাফিয়ে এসে আমার আঙুলের উপর বসে বসে চেরিফলের মোরব্বা খেত। আমার এই নূতন পোষা প্রাণীটির কি কি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন, মিস্ সালিভান আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর আমি তার স্নানের ব্যবস্থা করে দিতাম, তার খাঁচাটি ঝেড়ে মুছে সাফ করে দিতাম, টাটকা দানা ও কুয়াঘর থেকে তুলে আনা জল দিয়ে তার পেয়ালা দুটি ভরে দিতাম, এবং তার দাঁড়ের গায়ে একটি চিক্-উইডের পল্লব বেঁধে দিতাম।

একদিন সকালে তার স্নানের জল আনতে যাবার সময় আমি তার খাঁচাটি জানালার উপর নামিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দরজা খুলছি এমন সময় টের পেলাম, একটা বড় বিড়াল আমার গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। প্রথমে আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েও আমি টিমের নরম ডানা দু'টির স্পর্শ পেলাম না, তার ছোট ছোট ছুঁচালো নখরগুলি দিয়ে সে আমার আঙুল আঁকড়ে ধরলো না। তখন আমি বুঝলাম আমার মধুকণ্ঠ ছোট্ট গাইয়েটিকে আর আমি দেখতে পাব না।

নয়

আমার জীবনের পরবর্তী মনে রাখবার মত ঘটনা হলো ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আমার বস্টন ভ্রমণ। ভ্রমণের উদ্যোগ আয়োজনের কথা, মা ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমার রওনা হয়ে যাওয়ার কথা, পথের কথা এবং অবশেষে বস্টনে এসে পৌঁছানোর কথা—সব আমার স্পষ্ট মনে আছে। যেন কালকের ঘটনা। দুই বছর আগেকার বাল্টিমোর ভ্রমণের সঙ্গে এই ভ্রমণের কত পার্থক্য! আমি আর আগেকার সেই চঞ্চল স্বল্পে উত্তেজিত ছোট্ট জীবটি ছিলাম না; আমাকে খুসি রাখবার জন্য রেলগাড়ীর সমস্ত যাত্রীর চেষ্টা-যত্নের আর প্রয়োজন ছিল না। আমি চুপ করে মিস্ সালিভানের পাশে বসে ছিলাম। গাড়ীর জানালা দিয়ে তিনি বাইরের যা যা দেখতে পাচ্ছিলেন সব আমাকে বর্ণনা করে শোনাচ্ছিলেন,—টেনেসী নদীর অপরূপ দৃশ্য, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুলোর ক্ষেত, পাহাড় ও জঙ্গল, আর স্টেশনে স্টেশনে হাসি খুসি নিগ্রোর দল। এরা হাত নেড়ে নেড়ে গাড়ীর লোকদের অভিনন্দন জানাচ্ছিল

আর অতি সম্বাদু মিছরি ও ভুট্টার খৈ-এর বোঝা গাড়ীতে বেচতে নিয়ে আসছিল। সাগ্রহ ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি মিস্ সালিভানের বর্ণনা শুনছিলাম। আমার আসনের বিপরীত দিকে আমার বড় নেকড়ার পুতুলটি বসানো রয়েছে। এই সেই ন্যান্সি। এখন তার পরণে নূতন রঙীন চেকের জামা, মাথায় কুঁচি-দেওয়া ঘাড়-ঢাকা কাপড়ের টুপী। দুটি পুঁতির চোখের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন মিস্ সালিভানের বর্ণনা আমাকে তন্ময় করে রাখতো না, তখন মাঝে মাঝে ন্যান্সির কথা আমার মনে হতো, তাকে কোলে তুলে নিতাম। অধিকাংশ সময় কিন্তু এই বিশ্বাস করে আমি আমার বিবেককে সান্ত্বনা দিতাম যে, ন্যান্সি ঘুমিয়ে আছে।

ন্যান্সির কথা আর আমার পরে বলবার সুযোগ হবে না ; সুতরাং আমরা বস্টনে পৌঁছুবার অনতিকাল পরেই তার যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছিল সে কথাটা এখানেই বলে রাখি। কাদার তৈরি পিঠে খেতে সে যে বিশেষ ভালোবাসতো এমন প্রমাণ কোনদিনই পাওয়া যায় নি। আমি কিন্তু জোর করে তাকে কাদার পিঠেই খাওয়াতাম। ফলে তার সারা গায়ে ধুলো কাদা মাখা ছিল। তাই দেখে পার্কিন্স্ ইন্স্টি-টিউশনের ধোপানী স্নান করানোর জন্য তাকে লুকিয়ে নিয়ে যায়। এই স্নানের ধকল ন্যান্সি সামলাতে পারে নি। এর পর যখন তাকে আবার দেখি তখন সে একটি বেঢপ তুলোর পিণ্ড মাত্র। তিরস্কারে ভরা পুঁতির চোখ দুটি যদি আমার দিকে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে না থাকতো তাহলে তাকে আমি চিনতেই পারতাম না।

অবশেষে যখন ট্রেন বস্টন স্টেশনে এসে থামলো, তখন মনে হলো যেন একটা চমৎকার রূপকথা সত্য হয়ে উঠেছে। যা ছিল "একদা কোন কালে" তাই হয়ে উঠলো "এখন" ; যা ছিল "অনেক দূরের দেশ" তাই এসে পড়লো "এখানে"।

অন্ধ-বিদ্যালয় পার্কিন্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউশনে এসে পৌঁছুবো মাত্রই আমি অন্ধ শিশুদের সঙ্গে ভাব করতে শুরু করে দিলাম। এরাও আঙুলের বর্ণমালা জানে দেখে এত খুসি হলাম যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার নিজের ভাষায় অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে পারবো! সে কি আনন্দ! এর আগে পর্যন্ত আমি যেন ছিলাম বিদেশী; আমাকে দোভাষীর সাহায্যে কথা বলতে হতো কিন্তু যে স্কুলে লরা ব্রিজ্‌ম্যান শিক্ষা লাভ করেছিলেন সে তো আমার নিজেরই দেশ! আমার নূতন বন্ধুরা যে সকলেই অন্ধ এ কথা ভালো করে বুঝতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। আমি জানতাম যে আমি দেখতে পাই না। কিন্তু যে সব উৎসুক, ভালোবাসায় উন্মুখ শিশুর দল আমার চারিদিকে ভীড় করে এসে দাঁড়ালো এবং সোৎসাহে আমার সঙ্গে খেলায় মেতে উঠলো, তারা যে সবাই অন্ধ, এ যেন সম্ভব বলেই মনে হয় নি। যখন লক্ষ্য করলাম যে, আমি কথা বলতে গেলে তারা আমার হাতের উপর হাত রাখে এবং আঙুল দিয়ে দিয়ে বই পড়ে, তখন আমি যে বিস্ময় ও দুঃখ অনুভব করেছিলাম তার কথা আমার এখনও মনে আছে। অবশ্য একথা আমাকে পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল, আমার নিজের কোন্‌ কোন্‌ ক্ষমতা নেই তাও আমি জানতাম; তথাপি আমার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণার উদ্ভব হয়েছিল যে, ওরা যখন শুনতে পায় তখন বোধ হয় ওদের "তৃতীয় নেত্র" ধরণের একটা দৃষ্টিশক্তিও আছে। একটার পর একটা শিশু—তাদের প্রত্যেকেরই সেই একই মহামূল্যবান শক্তির অভাব,—এ দেখবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তারা এত সুখী, এত সন্তুষ্ট চিত্ত ছিল যে, তাদের আনন্দময় সাহচর্যে আমি সকল বেদনার কথা বিস্মৃত হয়ে গেলাম।

অন্ধ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটি দিন কাটানোর পরই আমি এই নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে স্বচ্ছন্দে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হলাম। দিনের

পর দিন দ্রুত কেটে যেতে লাগলো ; প্রত্যহ একটা প্রীতিকর অভিজ্ঞতার পর আর একটা প্রীতিকর অভিজ্ঞতার জন্য আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আমি সত্যই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারতাম না যে, পৃথিবীর আর বেশী কিছু অবশিষ্ট আছে। কারণ বস্টন নগরী দেখে আমার মনে হলো, সৃষ্টির এই বুঝি আরম্ভ আর এই-ই শেষ।

যখন বস্টনে ছিলাম তখন একদিন আমরা বাঙ্কার হিল-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। এইখানেই আমি আমার ইতিহাসের প্রথম শিক্ষা লাভ করি। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেইখানে যে সব সাহসী বীরপুরুষেরা একদিন যুদ্ধ করেছিল, তাদের কথা চিন্তা করে আমি খুব উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলাম। সিঁড়ির ধাপ গুনে আমি স্মৃতিস্তম্ভটিতে আরোহণ করতে লাগলাম। উঁচু থেকে যতই আরও উঁচুতে উঠতে লাগলাম ততই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম,—সৈন্যেরা কি এই প্রকাণ্ড সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নীচে মাটির উপরকার শত্রুপক্ষের উপর গুলি চালিয়েছিল ?

এর পরদিন আমরা জলপথে প্লিমাথ যাই। এই আমার প্রথম সমুদ্র-যাত্রা, প্রথম বাষ্পীয় পোতে ভ্রমণ। জাহাজটিকে জীবনীশক্তি ও গতিবেগে পরিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যন্ত্রপাতির গম্ভীর নির্ঘোষ শুনে আমার মনে হলো বুঝি মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি হলে আমাদের বাড়ীর বাইরে আর চড়ুইভাতি করা যাবে না,—এই ভেবে তখন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। প্লিমাথ-এ দেখা অন্য সব জিনিসের চেয়ে যে পাথরখানার উপর প্রথম ঔপনিবেশিক যাত্রিদল জাহাজ থেকে অবতরণ করেছিলেন সেইখানার প্রতি আমার মন বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল। পাথরখানাকে আমি স্পর্শ করতে পেরেছিলাম ; সেইজন্যই বোধ হয় প্রথম ঔপনিবেশিকদের আগমন, তাদের দুঃখকষ্ট ও তাদের মহান কার্যকলাপ আমার কাছে এত বাস্তব হয়ে উঠেছিল। একজন সহৃদয় ভদ্রলোক পিলগ্রিম হল-এ আমাকে

এই শিলাখণ্ড-এর পাথরখানির ছোট্ট একটি নকল (model) দিয়েছিলেন। আমি বহুবার এটি হাতে করে এর বঙ্কিম গড়নের উপর, এর মাঝখানকার ফাটলটির উপর, এর উপরে ক্ষোদিত "১৬২০" তারিখটির উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ঔপনিবেশিকদের অত্যাশ্চর্য কাহিনীর যেটুকু জানি মনে মনে তার পর্যালোচনা করেছি।

তাঁদের সেই গৌরবময় অভিযানের কথা চিন্তা করলে আমার শিশু-কল্পনা উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতো। আমি এদের আদর্শস্থানীয় বলে মনে করতাম; বিদেশে বাসস্থানের সন্ধানে যাঁরা দেশ ছেড়ে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে উদার বলে মনে করতাম। আমি ভাবতাম, তাঁরা শুধু নিজেদের স্বাধীনতাই চান নি, সর্বমানবের স্বাধীনতাও চেয়েছিলেন। বহু বৎসর পরে আমি যখন জানতে পারি যে, আমাদের এই সুন্দর মাতৃভূমিকে গড়ে তোলার কাজে তাঁরা যে সাহস ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্য আমরা গৌরব অনুভব করি বটে, কিন্তু তাঁদের নানা পর-পীড়নের কাহিনী শুনলে লজ্জায় আমাদের সর্বশরীর শিউরে ওঠে,— তখন আমার মন তীব্র বিস্ময় ও নৈরাশ্যে ভরে উঠেছিল।

বস্টনে আমার যে সব বন্ধুলাভ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে মিঃ উইলিয়ম এণ্ডিকট ও তাঁর কন্যার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা আমার প্রতি যে সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছিলেন, বীজের মত অঙ্কুরিত হয়ে তা কালক্রমে বহু সুখময় স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। একদিন আমরা বেভার্লি ফার্মস্-এ অবস্থিত তাঁদের চমৎকার বাসভবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি তাঁদের গোলাপবাগানে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। তাঁদের দুটি কুকুর ছিল। একটির নাম লিও; প্রকাণ্ড তার চেহারা। আর একটি ক্ষুদ্রকায়, তার নাম ফ্রিট্স্; তার লম্বা লম্বা কান আর সারা গায়ে কোঁকড়া কোঁকড়া লোম। তারা এসে আমাকে অভ্যর্থনা করেছিল। আর ছিল নিম্রড

নামে একটি অতি ক্ষিপ্রগামী ঘোড়া ; আমার হাতের মধ্যে এসে নাক গুঁজে দিয়েছিল, পরিবর্তে পেয়েছিল একটি আদরের চাপড় আর একদলা চিনি। সে সব কথা মনে করলেও আনন্দ হয়। সেখানকার সমুদ্রতীরের কথাও মনে পড়ে ; এইখানে প্রথম আমি বালি নিয়ে খেলা করি। এখানকার বালি শক্ত ও সমতল ; ক্যার ও ঝিনুকে ভর্তি ব্রুস্টারের ঝুরঝুরে কচ্‌কচে বালির সঙ্গে এর পার্থক্য প্রচুর। মিঃ এণ্ডিকট আমাকে বড় বড় জাহাজের গল্প বলেছিলেন ; এগুলি বস্টন থেকে বেরিয়ে এসে এখানকার পাশ দিয়ে ইউরোপের দিকে চলে যায়। এরপর তাঁর সঙ্গে আমার বহুবার দেখা হয়েছিল ; তিনি বরাবরই আমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। সত্য কথা বলতে কি, আমি যখন বস্টনকে "সহৃদয় জনগণের নগরী" বলে বর্ণনা করি, তখন আমার তাঁর কথাই মনে পড়েছিল।

দশ

গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে পার্কিন্‌স্‌ ইন্‌স্টিটিউশন বন্ধ হবার ঠিক আগে স্থির হলো, আমি কড্‌ অন্তরীপে অবস্থিত ব্রুস্টার নামক স্থানে আমাদের প্রিয় বান্ধবী মিসেস্‌ হপকিন্‌সের বাড়ীতে গিয়ে অবকাশ যাপন করবো। শুনে আমি খুব খুসি হয়ে উঠলাম, কারণ আমার মন নানা প্রত্যাশিত আনন্দের সম্ভাবনায় এবং সমুদ্র সম্বন্ধে শোনা বহু বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল।

সেবারকার গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে জীবন্ত স্মৃতি সমুদ্রের স্মৃতি। আমি চিরকাল সমুদ্র থেকে বহুদূরে বাস করেছি ; সমুদ্রের নোনা হাওয়ার

একবার নিঃশ্বাস নেবার সৌভাগ্যও আমার কোনদিন হয় নি। কিন্তু "আমাদের পৃথিবী" নামক মস্ত বড় একখানা বই-এ আমি সমুদ্রের বর্ণনা পড়েছিলাম। তার ফলে আমার মন বিস্ময়ে ভরে গিয়েছিল; বিশাল সমুদ্র-মহারাজকে স্পর্শ করবার ও তাঁর গর্জন অনুভব করবার প্রবল অভিলাষ মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। সুতরাং যখন আমি জানতে পারলাম, এতদিনে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে, আমার ক্ষুদ্র হৃদয় উৎসাহের উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলো।

আমাকে স্নানের পোষাক পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক লাফে গরম বালির উপর গিয়ে দাঁড়ালাম এবং শঙ্কালেশহীন চিত্তে শীতল জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি অনুভব করতে লাগলাম, বড় বড় ঢেউ এসে দুলে দুলে নেমে যাচ্ছে। জলের মৃদু লঘু আন্দোলন আমার মনে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুললো। সহসা আমার আনন্দের আবেগ আতঙ্কে পরিণত হয়ে গেল। একখানা পাথরের হোচট খেয়ে আমি পড়ে গেলাম; পরমুহূর্তেই আমার মাথার উপর দিয়ে হুড় হুড় করে জলস্রোত বয়ে যেতে লাগলো। কোন একটা অবলম্বন ধরবার জন্য আমি দুই হাত বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ধরতে গিয়ে পেলাম শুধু জল আর ঢেউ-এর তোড়ে আমার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত কতকগুলি সামুদ্রিক উদ্ভিদ। আত্মরক্ষার জন্য পাগলের মত চেষ্টা করতে লাগলাম; কিন্তু সব বৃথা! ঢেউগুলি যেন আমাকে নিয়ে খেলা করছিল; উদ্দাম আনন্দে এক ঢেউ থেকে অন্য ঢেউএর উপর আমাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল। সে এক ভয়াবহ অনুভূতি! স্থিরা, পরিচিতা পৃথিবী পায়ের তলা থেকে সরে গেছে; এই অদ্ভুত সর্বগ্রাসী জলরাশি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর সব কিছু আড়াল করে ফেলেছে। আলো, হাওয়া, উত্তাপ, ভালোবাসা—সব মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবশেষে সমুদ্র যেন তার এই নূতন খেলনাটি নিয়ে

খেলা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়লো ; আমাকে আবার তীরভূমিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই আমি আমার শিক্ষয়িত্রীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আঃ! সেই দীর্ঘকাল স্থায়ী স্নেহকোমল আলিঙ্গনের মধ্যে সে কি আরাম! আকস্মিক আতঙ্ক থেকে সামলে উঠে যখন আমার কথা বলবার মত অবস্থা হলো, তখন আমি প্রথমেই প্রশ্ন করলাম, "জলে নুন গুলে দিল কে ?"

জলের মধ্যে আমার প্রথম অভিজ্ঞতার ধাক্কা সামলে উঠবার পর স্নানের পোষাক পরে একখানা বড় পাথরের উপর চুপ করে বসে থাকতে আমার আনন্দ হতো। অনুভব করতে পারতাম, বড় বড় ঢেউ এসে পাথরের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে ; জলকণার ঝাপ্‌টা উঠে আমার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিত। ঢেউগুলি তাদের প্রচণ্ড ওজন নিয়ে তীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো ; উপল রাশির ঝঞ্ঝনা অনুভব করতে পারতাম। তরঙ্গ রাজির প্রবল অভিঘাতে সমগ্র তীরভূমি প্রকাশিত হয়ে উঠতো ; তাদের স্পন্দন-ধ্বনি বায়ুমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হতো। ঢেউগুলি সাঁ সাঁ করে পিছু হঠে যেত, তারপর শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এসে আরও জোরে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আর আমি মহাবেগে ধাবমান সমুদ্রের গর্জন ও তরঙ্গ-ভঙ্গ অনুভব করতে করতে মোহগ্রস্তের মত নিশ্চল হয়ে আমার শিলাসন আঁকড়ে বসে থাকতাম।

সমুদ্রতীরে যতক্ষণই বসে থাকি না কেন কিছুতেই আমার ক্লান্তি হতো না। নির্মল, পবিত্র ও উন্মুক্ত সমুদ্রবায়ুর আস্বাদ নিতে নিতে মনে হতো যেন ভিতরে একটা সুশীতল, শান্তি প্রদায়িনী চিন্তার অস্তিত্ব অনুভব করছি। তা ছাড়া কড়ি-ঝিনুক, পাথরের নুড়ি আর ছোট ছোট জীবন্ত প্রাণি সংলগ্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদগুলি আমার কাছে সর্বদাই মনোমুগ্ধকর বলে মনে হতো। একদিন মিস্ সালিভান একটি অদ্ভুত জীবের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। অল্প জলে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, এমন সময় তিনি সেটাকে

ধরেন। এটি একটি প্রকাণ্ড অশ্বক্ষুরাকৃতি কাঁকড়া। এই জাতীয় কাঁকড়া এই আমি প্রথম দেখলাম। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম; নিজের বাসগৃহটিকে সে যে কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছে, এই ব্যাপারটি আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য বলে মনে হলো। হঠাৎ খেয়াল হলো, এটাকে পুষতে পারলে বড় ভালো হয়। সুতরাং আমি দু'হাত দিয়ে সেটার লেজ ধরে সেটাকে বাড়ী বয়ে নিয়ে গেলাম। এই বাহাদুরিটি করে আমি ভারী গৌরব অনুভব করেছিলাম, কারণ কাঁকড়াটার দেহের ওজন খুব বেশী ছিল; সেটাকে মাইল খানেক টেনে নিয়ে যেতে আমাকে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। কুয়ার কাছে একটা বড় জলপাত্রের ভিতর সেটাকে রেখে না দেওয়া পর্যন্ত আমি মিস্ সালিভানকে হাঁফ ছাড়তে দিই নি। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল এখান থেকে সে কিছুতেই পালাতে পারবে না। কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে জলপাত্রের কাছে গিয়ে তাকে আর দেখতে পেলাম না। সে কোথায় গেল, কি করেই বা পালালো, কেউ তা বুঝতে পারলো না। সে সময়ে অবশ্য আমার খুবই মনোভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই নিরীহ অবোলা জীবটিকে তার নিজস্ব জলনিবাস থেকে জোর করে ধরে এনে আমি করুণা বা বুদ্ধিমত্তা কিছুরই পরিচয় দিই নি। কিছুদিন পরে আমি এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করেছিলাম যে, এতদিনে সে বোধ হয় সমুদ্রে ফিরে গেছে।

এগারো

হেমন্তকালে নানা সুখস্মৃতিতে পরিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে আমি আমার দক্ষিণাঞ্চলের গৃহে ফিরে এলাম। এই উত্তরাঞ্চল ভ্রমণের কথা মনে হলেই

আমার হৃদয় বিস্ময়ে ভরে ওঠে। এই ভ্রমণের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা কি বিচিত্র, কি রসসমৃদ্ধ! এই থেকেই যেন আমার জীবনের সব কিছুর সূচনা। এক নূতন সৌন্দর্যময় জগতের ঐশ্বর্যভাণ্ডার যেন আমার পায়ের কাছে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হলো। পথের প্রতিটি বাঁকে আমি নূতন আনন্দ জ্ঞান আহরণ করলাম। সমস্ত জিনিসের মধ্যে আমি আমার নিজের জীবন মিশিয়ে দিতে শিখলাম। এক মুহূর্ত আমি নিশ্চল হয়ে থাকি নি। যে সমস্ত কীটপতঙ্গ একটিমাত্র দিনের মধ্যে তাদের সমগ্র অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়, তাদের মত আমারও জীবন গতি ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। হাতের মধ্যে বানান করে করে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন এমন বহু লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সহমর্মিতার আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে চিন্তার সঙ্গে চিন্তার মিলন ঘটেছিল। সত্যই সে এক অলৌকিক ব্যাপার! আমার মন ও অন্য সবাই-এর মনের মধ্যে যে ঊষর ভূমির অন্তরায় ছিল সেখানে কুসুমিত হয়ে উঠেছিল প্রস্ফুটিত গোলাপের শোভা!

পরিবারের আর সকলের সঙ্গে আমি আমাদের গ্রীষ্মনিবাসে হেমন্তের মাস ক'টি অতিবাহিত করলাম। এই গ্রীষ্মনিবাস টাস্কাম্বিয়া থেকে ন্যূনাধিক চৌদ্দ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এর নাম ছিল "ফার্ন কোয়ারি," কারণ এর কাছেই একটি বহুকাল-পরিত্যক্ত চুনাপাথরের "কোয়ারি" বা খোলা খনি ছিল। উপরের শৈলমালা থেকে উদ্ভূত তিনটি লীলাচঞ্চল পার্বত্য স্রোতস্বিনী এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতো। যেখানেই তাদের সামনে শিলাপ্রস্তরের প্রতিবন্ধক পড়তো, সেখানেই তারা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হেসে আকুল হয়ে ছোট ছোট জলপ্রপাতের সৃষ্টি করতো! খোলা খনিটি সর্বত্র ফার্ন গাছের জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। নীচের চুনা-পাথর একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ; স্থানে স্থানে জলধারা-

গুলিও চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিল। পর্বতের অবশিষ্টাংশ ঘন বনে ঢাকা। তার মধ্যে ছিল বিরাট বিরাট ওক্‌ গাছ আর শেওলায় ছাওয়া স্তম্ভের মত গুঁড়িবিশিষ্ট অনেক রকমের বড় বড় চিরহরিৎ বৃক্ষ। এদের ডালপালা থেকে মিস্‌লটো আর আইভিলতা মালার মত ঝুলে থাকতো। আর ছিল বহু পার্সিমন গাছ। এই গাছ থেকে এক অপরূপ মৃদু সুগন্ধি বেরিয়ে বনের সমস্ত অলিগলি ভরপুর করে রাখতো; নাকে এসে পৌঁছুলে মন খুসি হয়ে উঠতো। এক এক জায়গায় বুনো মাস্‌কাডাইন ও স্কাপারনং লতার জাল এক গাছ থেকে আর এক গাছ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে থাকতো, আর এই সব লতাকুঞ্জের মধ্যে প্রজাপতি ও গুঞ্জনরত নানা পতঙ্গ সর্বদা ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াতো। অপরাহ্ণের পড়ন্ত বেলায় এই জটিল জঙ্গলের শ্যামল গুহা-গহ্বরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে, আর দিনের শেষে মাটি থেকে যে স্নিগ্ধ মনোরম গন্ধ নির্গত হতো তার আঘ্রাণ নিতে আমার বড় ভালো লাগতো।

আমাদের আবাস-কুটিরটি অযত্ন-নির্মিত অস্থায়ী শিবিরের মত দেখতে ছিল। কিন্তু এর অবস্থান ছিল অতি সুন্দর,—পর্বতের চূড়ায়, ওক্‌ ও পাইন বনের মধ্যে। মাঝের খোলা লম্বা হলঘরের দু'পাশে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর; আর সব ঘিরে চারিদিকে একটা চওড়া আবরণহীন বারান্দা। আরণ্য সুরভিময় পার্বত্য হাওয়া এই বারান্দার উপর দিয়ে বয়ে যেত। আমরা প্রায় সব সময় এই বারান্দার উপরেই থাকতাম;—সেখানেই কাজ করতাম, সেখানেই খেতাম, সেখানেই খেলা করতাম। খিড়কির দরজার কাছে একটা প্রকাণ্ড বাটারনাট গাছ ছিল; সিঁড়ির ধাপগুলি এর গুঁড়ি বেষ্টন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর সামনের দিকের গাছগুলি ঘরের এত কাছে ছিল যে, আমি সেগুলিকে হাত দিয়ে ছুঁতে পারতাম; বাতাস যখন তাদের ডালপালা দুলিয়ে দিয়ে যেত কিংবা হেমন্তের ঝাপ্‌টা

হাওয়ায় যখন তাদের পাতা ঝরে ঘুরপাক খেতে খেতে নীচে পড়ে যেত, তাও আমি অনুভব করতে পারতাম।

"ফার্ন্ কোয়ারি"-তে অনেক-অভ্যাগত আসতেন। সন্ধ্যায় পর খোলা জায়গায় আগুন জ্বলা হতো; পুরুষ মানুষেরা তার পাশে বসে তাস খেলতেন, আর না হয়তো নানা কথাবার্তা ও আমোদ প্রমোদে সময় কাটাতেন। মাছ, পাখি ও চতুষ্পদ জীবজন্তু শিকারের বহু বিচিত্র কাহিনী তাঁরা বর্ণনা করতেন;—কত বুনো হাঁস ও টার্কি পাখি তাঁরা গুলি করেছেন, ছিপ দিয়ে কত 'দুরন্ত ট্রাউট্' মাছ ধরেছেন, কত দারুণ ধূর্ত খেঁকশিয়ালি শিকার করেছেন, কত সুচতুর অপোসামকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছেন, কত ক্ষিপ্রগতি হরিণকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে ফেলেছেন! শুনতে শুনতে মনে হতো, এই সব কৌশলী শিকারীদের হাতে সিংহ, ব্যাঘ্র বা অন্যান্য বন্যজন্তু কারও বুঝি নিস্তার নেই। অবশেষে অনেক রাত্রে যখন এই আনন্দময় বন্ধুচক্র ভেঙে যেত, তখন তাঁদের বিদায়-সম্ভাষণ হতো, "কাল সকালেই শিকার শুরু!" পুরুষ মানুষেরা আমাদের ঘরের দরজার বাইরে হলঘরে ঘুমুতেন। যো-সো করে যোগাড় করা বিছানায় শুয়ে থাকা শিকারীদের ও কুকুরগুলির গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস আমি ঘরের ভিতর থেকে অনুভব করতে পারতাম।

ভোরবেলায় কফি তৈরির গন্ধে, বন্দুকের খটাখট্ শব্দে আর পুরুষদের চলাচলের ভারী পদধ্বনিতে আমার ঘুম ভেঙে যেত। শুনতাম, তাঁরা পরস্পরকে শিকার-মরসুমের শ্রেষ্ঠ সাফল্যের আশ্বাস দিচ্ছেন। অতিথিরা সহর থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। ঘোড়াগুলি সারারাত গাছতলায় বাঁধা থাকতো। শুনতে পেতাম, তারা দাপাদাপি করছে, শিকারে রওনা হয়ে যাবার জন্য অধীর আগ্রহে উচ্চ হ্রেষাধ্বনি করছে; অবশেষে শিকারীরা সব ঘোড়ায় চড়ে বসতেন। তারপর, প্রাচীন গানগুলিতে যেমন বর্ণনা

আছে, ঠিক তেমনিভাবে বল্‌গা-লাগামের ঝঞ্ঝনার সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া হতো, চাবুকের সপাৎ সপাৎ শব্দ শোনা যেত, শিকারী কুকুরের দল সর্ব্বাগ্রে ছুটে বেরিয়ে যেত, দারুণ হৈ-হল্লার সঙ্গে, হো-হো করে পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে করতে দিগ্বিজয়ী শিকারীর দল শিকারে বেরিয়ে যেতেন।

সকালে আর খানিকটা সময় কাটবার পর আমরা আস্ত জানোয়ার ঝল্‌সে রাঁধবার আয়োজন শুরু করতাম। মাটিতে বড় একটা গর্ত্ত করে তার মধ্যে আগুন জ্বালানো হতো। গর্তের উপর বড় বড় লাঠি আড়াআড়ি করে সাজানো হতো। সেগুলো থেকে মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, আর শিকের সাহায্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেঁকা হতো। আগুনের চারিদিকে বসে একদল নিগ্রো লম্বা লম্বা গাছের ডাল দিয়ে মাছি তাড়াতো। মাংসের লোভনীয় গন্ধে টেবিল সাজানোর অনেক আগেই আমার পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠতো।

উদ্যোগ-আয়োজনের হাঙ্গামা ও উত্তেজনা যখন চরমে উঠতো তখন শিকারীর দল দেখা দিতেন। দু'জন তিনজন করে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁরা ফিরে আসতেন, নিজেরা পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্তদেহ, ঘোড়াগুলির সর্বাঙ্গ ফেনায় আবৃত, কুকুরগুলি ভগ্নোৎসাহ হয়ে হাঁফাচ্ছে। কিন্তু শিকারীদের হাতে একটি প্রাণীও মারা পড়েনি! প্রত্যেকেই ঘোষণা করতেন, তিনি অন্ততঃ একটা হরিণের দেখা পেয়েছিলেন, আর সেটা বেশ কাছেই এসে পড়েছিল। কিন্তু কুকুরগুলি যত জোরেই শিকারের পিছন পিছন ছুটুক না কেন, যত চমৎকার নিশানা করেই বন্দুক বাগানো হোক না কেন, বন্দুকের ঘোড়া যখন টেপা হলো, তখন আর হরিণের টিকিটিও দেখা যায় নি। সেই যে গল্পে একটি ছোট ছেলের কথা আছে, যে খরগোসের পায়ের দাগ দেখেই বলেছিল, খরগোসটাকে প্রায় দেখে ফেলেছে,—এঁদের

দশাও তেমনি। যাই হোক, শীঘ্রই সবাই আশাভঙ্গের কথা ভুলে গিয়ে ভোজনে বসতেন। হরিণের মাংসের ভোজ অবশ্য তাঁদের অদৃষ্টে জুটতো না, বাছুরের মাংস আর কলসানো শূকরছানা দিয়েই কোনমতে কাজ চালিয়ে নিতে হতো।

একবার গ্রীষ্মকালে আমার টাট্টুঘোড়াটিকে আমি "ফার্ণ কোয়ারি"-তে নিয়ে এসেছিলাম। আমি তার নাম দিয়েছিলাম "ব্ল্যাক বিউটি", কারণ ঐ নামের বইখানা আমি সদ্য সদ্য পড়েছিলাম, এবং নাম-ভূমিকার ঘোড়াটির সঙ্গে আমার ঘোড়ার সর্বাংশে সাদৃশ্য ছিল, গায়ের চকচকে কালো চামড়া থেকে কপালের শাদা তারকা চিহ্নটি পর্যন্ত। আমার জীবনের বহু সুখের মুহূর্ত এর পিঠে চড়ে কেটেছে। মাঝে মাঝে যখন বিপদের কোন সম্ভাবনা থাকতো না, তখন আমার শিক্ষয়িত্রী তার মুখের হাত-লাগামটি ছেড়ে দিতেন। ঘোড়া তখন নিজের ইচ্ছামত চলতে থাকতো কিংবা থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাস খেত অথবা সরু পথের দুই পাশের গাছ থেকে খুঁটে খুঁটে পাতা ছিঁড়ে নিত।

কোন কোন দিন সকালবেলা ঘোড়ায় চড়তে ইচ্ছা হতো না। সেদিন প্রাতরাশের পর আমি ও আমার শিক্ষয়িত্রী বনের মধ্যে ঘুরতে যেতাম। গাছপালা ও লতাপাতার মধ্যে আমরা ইচ্ছা করে পথ হারিয়ে ফেলতাম; গরু ও ঘোড়ার পায়ে চলা পথ ছাড়া আর কোন পথেই আমাদের চলবার উপায় থাকতো না। প্রায়ই আমরা এমন সব দুর্গম ঝোপের সামনে এসে পড়তাম যে বাধ্য হয়ে অনেকটা ঘুরে পথ করে নিত। যখন আমাদের আবাস-কুটিরে ফিরে আসতাম, তখন আমরা বোঝা বোঝা লরেল, গোল্ডেন রড, ফার্ণ ও জমকালো সোয়াম্প্-ফ্লাওয়ার ফুল সঙ্গে নিয়ে আসতাম। এই ফুলগুলি দক্ষিণাঞ্চলে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

কখনও কখনও মিলড্রেড ও আমার ছোট ছোট খুড়তুতো ভাই-বোনদের

নিয়ে আমি পার্সিমন ফল কুড়োতে যেতাম। আমি এ ফল খেতাম না; কিন্তু এর সুগন্ধ আমার বড় ভালো লাগতো। ঘাস আর ঝরাপাতার মধ্যে ফল খুঁজে বেড়াতেও আমি খুব আনন্দ পেতাম। আমরা মাঝে মাঝে বাদাম তুলতেও যেতাম। চেস্টনাটের কাঁটাওয়ালা খোসা ছাড়াতে এবং হিকরিনাট ও ওয়ালনাটের শক্ত খোলা ভাঙতে আমার ভাইবোনদের আমি সাহায্য করতাম। বিশেষ করে ওয়ালনাটগুলি মস্ত বড় বড় আর ভারী মিষ্টি হতো।

পাহাড়ের পাদদেশে একটা রেলের রাস্তা ছিল। ছেলেমেয়েরা বাড়ী বসে বসে দেখতে পেত রেলগাড়ী সাঁ সাঁ করে ছুটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হুইসলের তীব্র আওয়াজ শুনে আমরা সিঁড়ির উপর ছুটে আসতাম; মিলড্রেড অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে আমাকে খবর দিত যে, একটা গরু কি ঘোড়া পথ ভুলে লাইনের উপর গিয়ে পড়েছিল। মাইল খানেক দূরে একটা গভীর গিরিখাতের উপর একটা খোলা রেলের পুল ছিল। এর উপর দিয়ে হেঁটে পার হওয়া ভয়ানক শক্ত ছিল। লোহার স্লীপার গুলি খুব ফাঁক ফাঁক করে বসানো ছিল, এবং সেগুলি এত সরু সরু ছিল যে, মনে হতো যেন ছুরির ফলার উপর পা ফেলে ফেলে হাঁটছি। বহুদিন আমি এর উপর দিয়ে হেঁটে পার হইনি। কিন্তু একদিন তাই করতে হলো। সেদিন মিলড্রেড, মিস্ সালিভান ও আমি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে ঘুরেও আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ মিলড্রেড তার ছোট্ট হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'ঐ যে রেলের পুল দেখা যাচ্ছে!" ঐ পথ দিয়ে যাবার আমাদের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে; চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। রেলের পুল পার হয়ে গেলে শীঘ্রই বাড়ী পেঁছানো যাবে। পায়ের আঙুল দিয়ে রেল লাইন ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাকে অতি সতর্ক ভাবে

এগুতে হচ্ছিল। কিন্তু আমি মোটেই ভয় পাই নি। বেশ এগিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দূর থেকে একটা অস্পষ্ট হুস্ হুস্ শব্দ শোনা গেল।

মিলড্রেড চেঁচিয়ে উঠলো, "আমি রেলগাড়ী দেখতে পাচ্ছি।" আর এক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়লো, কিন্তু আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আড়াআড়ি ঠেকনা দেবার লোহার ডাণ্ডাগুলির উপর দাঁড়ালাম। গাড়ী আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে যেতে লাগলো। এঞ্জিনের তপ্ত হাওয়া আমার মুখে এসে লাগছে, অনুভব করলাম। ধোঁয়া আর ছাই-এ আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। রেলগাড়ী হুড় হুড় করে ছুটে চলেছে, পুল দুলছে, থরথর করে কাঁপছে; আমি ভাবলাম, আর রক্ষা নেই, সবাই মিলে খাদের মধ্যে পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে মারা যাব। বহু কষ্টে আবার রেল লাইনের উপর উঠলাম। সন্ধ্যা হবার অনেক পরে ঘরে ফিরলাম। কিন্তু ফিরে দেখলাম বাড়ী ফাঁকা; সবাই আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

বারো

প্রথম বস্টন যাত্রার পর থেকে প্রায় প্রতি বৎসর শীতকালটা আমি উত্তরাঞ্চলেই কাটাতাম। এবার আমি যাই নিউ ইংলণ্ডের একটা গ্রামে। সেখানে বহু হিমে জমাট-বাঁধা হ্রদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার ক্ষেত্র ছিল। এই আমি প্রথম তুষার রাজ্যের রত্নাগারে প্রবেশ করবার সুযোগ পেলাম। এমন সুযোগ আমার জীবনে পূর্বে কখনও আসে নি।

একদিন আমি সহসা আবিষ্কার করলাম, কোন্ এক রহস্যময় হাত বৃক্ষলতা ও ঝোপঝাড়ের সমস্ত পত্রভার খসিয়ে দিয়েছে; এখানে ওখানে দুই একটি শুষ্ক শীর্ণ পাতা মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। এই আবিষ্কার আমাকে যে

কতখানি বিস্মিত করেছিল তা এখনও আমার মনে আছে। পাখিরা সব উড়ে চলে গেছে; নিষ্পত্র গাছে গাছে তাদের খালি বাসাগুলি তুষারে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। পর্বতে-প্রান্তরে শীতঋতুর আবির্ভাব হয়েছে। তার হিমশীতল স্পর্শে পৃথিবীর দেহ অসাড় হয়ে গেছে। গাছপালার অন্তরাত্মা যেন তাদের শিকড়ের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে অন্ধকারে গুটি সুটি হয়ে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে রয়েছে। সর্বজীবনের জোয়ারে ভাঁটা লেগেছে। আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য থাকা সত্ত্বেও দিনের দশা দেখে মনে হচ্ছে—

সে যেন কুঁকড়ে গেছে, ঠাণ্ডায় হিম হয়ে গেছে;
তার শিরায় শিরায় জরার প্রতাপ,—রক্ত নেই;
অথর্ব স্থবিরের মত সে একবার উঠে দাঁড়ালো,
ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি মেলে
ধরণী ও সমুদ্রকে শেষ দেখা দেখে নিল।

শুকনো ঘাস আর ঝোপঝাড় সব তুষারকণার অরণ্যে পরিণত হয়ে গেছে।

তারপর একদিন হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগলো। তুষার-ঝঞ্ঝা হবে,—এ তারই পূর্বলক্ষণ। প্রথম যে দুই একটি ছোট ছোট তুষারফুল্কি পড়তে শুরু করেছিল, তাদের স্পর্শ অনুভব করবার জন্য আমরা ছুটে ঘরের বাইরে গেলাম। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত আকাশের ঊর্ধ্বলোক থেকে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার পৃথিবীর উপর ঝরে পড়তে লাগলো। ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ সমতল হয়ে উঠতে লাগলো। তুষারময়ী নিশিথিনী ধরাতলে নেমে এল। সকালে দেখা গেল, বাইরের দৃশ্যের কোন অংশকেই আর প্রায় চেনা যায় না। সমস্ত পথঘাট ঢাকা পড়ে গেছে; চেনা জায়গা একটাও আর দেখা যাচ্ছে না; শুধু এক বিস্তীর্ণ তুষার-মরুভূমির মধ্যে গাছগুলি মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার সময় উত্তর পূর্ব থেকে জোর হাওয়া বইতে আরম্ভ হলো। তুষারফুল্কিগুলি এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে মহা হুল্লোড় বাধিয়ে দিল। মস্তবড় বহ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আমরা মজার মজার গল্প করতে লাগলাম, হুড়োহুড়ি খেলা করতে লাগলাম; একেবারেই ভুলে গেলাম যে, আমরা এক জনপ্রাণিহীন নির্জনতার মধ্যে অবস্থান করছি, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু রাত্রে ঝড়ের প্রকোপ এত বেড়ে উঠলো যে একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিউরে উঠতে লাগলো। সমগ্র ভূভাগের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বাতাস দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলো; ঘরের কড়ি-বরগায় মোচড় লেগে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হতে লাগলো; বাড়ীর চারিপাশের গাছগুলির ডালপালা ঝট্‌পট করতে করতে ঘরের জানলায় এসে আছড়ে পড়তে লাগলো।

ঝড় আরম্ভ হবার পর তিন দিনের দিন তুষারপাত বন্ধ হলো। সূর্যদেব মেঘ ভেঙে বেরিয়ে এসে বিরাট এক উঁচু নীচু শুভ্র প্রান্তরের উপর কিরণ-বর্ষণ শুরু করলেন। দেখা গেল চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু উঁচু উঁচু তুষারের স্তূপ, অদ্ভুত অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট উচ্চ-চূড় তুষার পিরামিড ও বায়ুতাড়িত তুষারের দুর্ভেদ্য জটিলতা।

তুষারের গাদাগুলির মধ্য দিয়ে কোদালের সাহায্যে সরু সরু পথ কাটা হলো। আমি গরম জামা ও ঘোমটাটুপী পরে বেরিয়ে পড়লাম। আমার গালে বাতাসের ছেঁকা এসে লাগছিল, যেন আগুনের হল্‌কা। খানিকটা কাটা পথ ধরে হেঁটে, খানিকটা ছোট ছোট তুষার স্তূপ ভেঙে পথ করে নিয়ে, আমরা একটি প্রশস্ত চারণ-ভূমির ঠিক ওপাশে অবস্থিত ছোট একটি পাইন বনে গিয়ে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। নিশ্চল পাইন গাছগুলি শাদা রং মেখে দাঁড়িয়ে আছে,—যেন মর্মর প্রস্তরে উৎকীর্ণ চিত্রমালা! বাতাসে

পাইন পাতার সুবাস নেই। সূর্যকিরণ গাছগুলির উপর এসে পড়ছে; ছোট ছোট ডালগুলি যেন হীরা-মাণিকের মত ঝলমল্ করছে, আমরা স্পর্শ করলেই ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে। এমন চোখ-ঝলসানো আলো যে, চিরান্ধকারের আবরণ ভেদ করে তা আমার চোখেও এসে পেঁছুচ্ছে।

দিন কাটতে লাগলো; সঙ্গে সঙ্গে তুষার-স্তূপগুলিও ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগেই আর একটা তুষার ঝঞ্ঝা এসে পড়লো। ফলে, সমগ্র শীতকালের মধ্যে আমি পায়ের নীচে মাটির স্পর্শ বোধ হয় একবারও পাই নি। কিছুদিন অন্তর অন্তর গাছগুলির তুষারাবরণ সরে যেত, নল-খাগড়া ও ঝোপঝাড়ের কঙ্কাল-সার মূর্তি দৃষ্টিগোচর হতো; কিন্তু আকাশে সূর্য থাকলেও নীচে হ্রদের জল সব সময়েই জমে কঠিন হয়ে থাকতো।

শীতকালে আমাদের সব চেয়ে প্রিয় খেলা ছিল তুষার-শকট চালনা। হ্রদের তীর জলের ধার থেকে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠেছে, দেখা যেত। এই সব খাড়াই বেয়ে আমরা তুষার-শকট নিয়ে নামতাম। শকটের মধ্যে আমরা উঠে বসার পর একটা ছোকরা আমাদের পিছন থেকে ঠেলে দিত; আমাদের যাত্রা শুরু হতো। তুষার-স্তূপের মধ্য দিয়ে ঝাঁপিয়ে, লম্ফে লম্ফে খানাডোবা পার হয়ে আমরা হুহু করে হ্রদের উপর গিয়ে পড়তাম। তারপর বিদ্যুৎবেগে হ্রদের ঝকমকে বুকের উপর দিয়ে ধাবিত হয়ে ওপারে গিয়ে উঠতাম। সে কি আনন্দ! সে কি মহোল্লাসের উত্তেজনা! যে শৃঙ্খল আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে উন্মত্ত আনন্দময় এক মুহূর্তের জন্য আমরা তা ছিঁড়ে ফেলতাম; মনে হতো যেন, পবন-দেবের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আমরাও দেবতা হয়ে গেছি!

তেরো

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি কথা বলতে শিখি। কানে শোনা যায় এমন ধ্বনি উচ্চারণ করবার ঝোঁক আমার মধ্যে বরাবরই খুব প্রবল ছিল। নিজের কণ্ঠের উপর এক হাত রেখে আমি মুখে নানা রকম আওয়াজ করতাম, আর অন্য হাত দিয়ে আমার ওষ্ঠাধারের নড়াচড়া অনুভব করতাম। আওয়াজ করে এমন যে কোন জিনিস পেলেই আমি খুসি হয়ে উঠতাম। বিড়ালের ঘড়ঘড়ানি বা কুকুরের ডাক অনুভব করতে আমার খুব ভালো লাগতো। কোন গায়ক যখন গান গাইতেন তখন তাঁর কণ্ঠের উপর, অথবা কোনো পিয়ানো যখন বাজানো হতো তখন সেই যন্ত্রের উপর হাত রাখতেও আমি খুব পছন্দ করতাম। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারানোর আগে আমি বেশ চট্‌পট কথা বলতে শিখছিলাম, কিন্তু আমার অসুখের পরে দেখা গেল, কানে শুনতে না পাওয়ার দরুণ আমার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত দিন আমি মায়ের কোলে বসে বসে তাঁর মুখের উপর হাত দিয়ে থাকতাম, কারণ তাঁর ঠোঁট দুখানি যেভাবে নড়তো তা অনুভব করে আমি ভারী মজা পেতাম। আমিও মাঝে মাঝে ঠোঁট নাড়তাম, কিন্তু কথা বলা কাকে বলে তা তখন আমি ভুলে গেছি। আমার বন্ধুরা বলেন, আমি স্বাভাবিক ভাবে হাসতে ও কাঁদতে পারতাম, আর কিছুদিন ধরে আমি নাকি নানারকম ধ্বনি শব্দাংশ উচ্চারণও করতাম। এগুলির দ্বারা আমি যে কিছু বলতে চাইতাম তা নয়; এই শব্দোচ্চারণ-প্রচেষ্টার মূলে ছিল আমার কণ্ঠযন্ত্রগুলি পরিচালনা করবার প্রবল প্রয়োজনবোধ। একটা কথার অর্থ কিন্তু তখনও আমার মনে ছিল। কথাটা হচ্ছে "water" (জল)। আমি এর উচ্চারণ

করতাম "wa-wa" ধ্বনি ক'রে। যখন মিস্ সালিভান আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ ক'রেন তখন এ কথাটাও ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে হতে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। কথাটা আঙুল দিয়ে বানান করতে শেখার পর তবে আমি এর উচ্চারণ চেষ্টা পরিত্যাগ করি।

অনেক দিন থেকেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে, আমি অপরের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের জন্য যে উপায় অবলম্বন করে থাকি আমার আশপাশের অন্যান্য লোকেরা তা থেকে পৃথক একটা উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। বধির শিশুকে কথা বলতে শেখানো যায় এই সংবাদটি জানতে পারার পূর্ব্বেই. ভাব বিনিময়ের যে উপায়টি আমার আয়ত্তে ছিল তার সম্বন্ধে আমার মনে একটা অসন্তোষ জমা হয়ে উঠছিল। যাকে একমাত্র অঙ্গুলি বর্ণমালার উপর নির্ভর করে থাকতে হয় সে সব সময়েই একটা বাধার বন্ধন, একটা আত্ম-সংকোচের ভাব অনুভব করে। এই অনুভূতি আমাকে চঞ্চল করে তুললো; কি যেন একটা অভাব আমার আছে, সেটি পূরণ করা প্রয়োজন,—এই ভবিষ্যমুখী চিন্তা আমাকে উৎপীড়িত করতে লাগলো। আমার মনের চিন্তা প্রায়ই মুখে এসে পড়তো, বায়ুস্রোতের বিপরীতগামী পাখির মত নিরর্থক ডানা ঝাপটে মরতো। কণ্ঠস্বর ও ওষ্ঠাধরের ব্যবহার কিছুতেই ছাড়তে চাইতাম না। বন্ধুরা আমার এই প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার চেষ্টা করতেন; তাঁদের ভয় হতো, এর ফলে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আমি আমার জিদ ছাড়লাম না। শীঘ্রই একটা আকস্মিক ঘটনার ফলে বাধার এই বিরাট প্রাচীর ভেঙে গেল। আমি রানহিল্ড্ কেয়াটার জীবন কাহিনী শুনলাম।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিসেস্ ল্যাম্সন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ইনি পূর্বে লরা ব্রিজম্যানের অন্যতমা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সম্প্রতি ইনি নরওয়ে ও সুইডেন ভ্রমণ করে এসেছিলেন। ইনিই আমাকে রানহিল্ড্

কেয়াটার গল্প বলেন। নরওয়ের এই বধির ও অন্ধ বালিকাটিকে সত্যসত্যই কথা বলতে শেখানো হয়েছিল। মিসেস্ ল্যাম্‌সন এই বালিকার সাফল্যের কাহিনী আমাকে শুনিয়ে শেষ করতে না করতেই আমার মনে উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠলো। তখুনি সংকল্প করলাম, আমিও কথা বলতে শিখবো। আমার শিক্ষয়িত্রী উপদেশ ও সাহায্যের জন্য আমাকে হোরেস ম্যান্ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মিস্ সারা ফুলারের কাছে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না; সারাক্ষণ ছটফট করে মরেছি। এই সুন্দরী মধুর-স্বভাবা মহিলা প্রস্তাব করলেন, তিনি নিজেই আমাকে শিক্ষা দেবেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে আমরা কাজ আরম্ভ করে দিলাম।

মিস্ ফুলারের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এই রকম: তিনি আমার হাতখানি নিয়ে হালকা ভাবে তাঁর মুখের উপর বুলিয়ে দিতেন; যখন তিনি কোন আওয়াজ করতেন তখন তাঁর জিভ ও ঠোঁট দুটির অবস্থান আমাকে অনুভব করতে দিতেন। আমি প্রত্যেকটি ভঙ্গি অনুকরণ করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিলাম; এক ঘণ্টার মধ্যেই "ম", "প", "আ", "স", "ত" ও "ই"—ভাষার এই ছয়টি মৌলিক উপাদান আয়ত্ত করে ফেললাম। মিস্ ফুলার আমাকে সর্বশুদ্ধ এগার দিন পড়িয়েছিলেন। "It is warm." (আজ গরম পড়েছে)—যেদিন আমি আমার জীবনের এই প্রথম সুসংবদ্ধ বাক্যটি উচ্চারণ করি, সেদিনকার বিস্ময় ও আনন্দ আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। সত্য বটে, ভাঙা ভাঙা বাধো বাধো স্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলাম, কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা তো বটে! আমার হৃদয় নূতন শক্তিলাভের আনন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল, ঐ কয়টি ভাঙা ভাঙা শব্দ সঙ্কেতের ভিতর দিয়ে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত বিশ্বাসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

যে বধির শিশু কানে-না-শোনা কথা মুখে উচ্চারণ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, সে যখন প্রথম একটি কথা বলতে সক্ষম হয়, তখন সে যে বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব করে, যে আবিষ্কারের আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ে, তা সে জীবনে কখনও ভুলতে পারে না। কারণ এ হচ্ছে তার পক্ষে নৈঃশব্দ্যের কারাগৃহ থেকে মুক্তিলাভ। পাখির গান, সঙ্গীতের সুর, ভালোবাসার আহ্বান—কিছুই সেই কারাগৃহের চির-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে পারে না। এমনি কোন বধির শিশুই শুধু বুঝতে পারবে, এর পর কি অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে আমি আমার পুতুল, গাছ-পাথর, পাখি ও অন্যান্য অবোলা জীবজন্তু—সবাই-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলাম ; আমার ডাক শুনে মিলড্রেড যখন কাছে ছুটে আসতো, কুকুরগুলি যখন আমার হুকুম অনুযায়ী কাজ করতো তখন কি আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো। আমি যে আজ বায়ুচারী ধ্বনির সাহায্যে কথা বলতে পারি, আমার কথা যে আজ কাউকে ভাষান্তরিত করে বোঝাতে হয় না, এ আমার পক্ষে ঈশ্বরের এক অনির্বচনীয় আশীর্বাদ। আমি কথা বলতে আরম্ভ করলাম ; মুখের ভাষার মধ্য দিয়ে আমার মনের আনন্দ-চিন্তাসমূহ পাখির মত আকাশে উড়ে বেরুতে শুরু করলো। আঙুলের ভাষার বাঁধন ছিঁড়ে এরা হয়তো কোনদিনই মুক্তিলাভ করতে পারতো না।

কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি সত্য সত্যই কথা বলতে শিখে গিয়েছিলাম একথা ভাবলে ভুল করা হবে। আমি কেবল ভাষার মূল-সূত্রগুলি আয়ত্ত করেছিলাম। আমি তখন যে ধরণের কথা বলতাম মিস্ ফুলার ও মিস্ সালিভান তা বুঝতে পারতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই আমার একশোটা কথার মধ্যে একটাও বুঝতে পারতো কিনা সন্দেহ। একথাও সত্য নয় যে, এই মূলসূত্রগুলি শিখবার পর আর যা শিখতে

বাকি ছিল সব আমি নিজেই শিখে নিয়েছিলাম। স্বাভাবিক ভাবে কথা বলার কৌশল আমি যতখানি আয়ত্ত করেছি, মিস্ সালিভানের প্রতিভা, কর্মনিষ্ঠা ও অক্লান্ত অধ্যবসায় ব্যতিরেকে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। প্রথমতঃ আমার মুখের কথা আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদেরও বোধগম্য করে তুলবার জন্য আমাকে দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি ধ্বনি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবার চেষ্টায় এবং সমস্ত ধ্বনিগুলিকে সহস্র বিভিন্নরূপে সম্মিলিত করবার চেষ্টায় মিস্ সালিভানের সাহায্য আমার প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হতো। এখনও প্রতিদিন আমি কোন শব্দের ভুল উচ্চারণ করলেই তিনি সেটি সংশোধন করে দেন।

এর অর্থ যে কি, যাঁরা বধির ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাঁরা সবাই তা জানেন। একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন, কি অদ্ভুত অদ্ভুত প্রতিবন্ধকের সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল। শিক্ষয়িত্রীর ওষ্ঠসঞ্চালন অনুধাবন করবার জন্য আমাকে নির্ভর করতে হতো একমাত্র আমার আঙুলগুলির উপর। তাঁর কণ্ঠের কম্পন, তাঁর ওষ্ঠাধর ও জিহ্বার নড়াচড়া, তাঁর মুখমণ্ডলের ভাবভঙ্গি—সবই আমাকে বুঝে নিতে হতো একমাত্র স্পর্শশক্তির সাহায্যে। কিন্তু এই স্পর্শশক্তি মাঝে মাঝে ভুল করে বসতো। এরূপ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে আমাকে বার বার শব্দ ও বাক্যগুলি আওড়াতে হতো। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই রকম করতে হতো। যখন বুঝতে পারতাম, গলার মধ্যে আওয়াজটি ঠিক হচ্ছে, তখন ক্ষান্ত হতাম। আমার কাজ ছিল অভ্যাস করা,—এক কথা ফিরে ফিরে বার বার অভ্যাস করা। অনেক সময় ক্লান্ত ও নিরুদ্যম হয়ে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু তখুনি মনে হতো, আমি শীঘ্রই বাড়ী যাব, বাড়ী গিয়ে আমার আপন জনদের দেখাতে পারবো, কি অসাধ্য-সাধন আমি করেছি। এই চিন্তা আবার আমাকে কর্মে প্রণোদিত করতো। যেদিন

আমার বাড়ীর লোকেরা আমার কীর্তি দেখে আনন্দিত হয়ে উঠবে, সেই দিনটির জন্য আমি উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতাম।

সকল বাধাবিঘ্নের চেয়ে একটি চিন্তা মনের মধ্যে বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল: "এইবার আমার ছোট বোন আমার কথা বুঝতে পারবে।" আনন্দে অধীর হয়ে বার বার একই কথা বলতাম, "আর আমি বোবা নই।" যেদিন আমি মায়ের সঙ্গে মুখ দিয়ে কথা বলতে পারবো, তাঁর ঠোঁটের উপর হাত রেখে তাঁর মুখের উত্তর বুঝতে পারবো, ভবিষ্যতের সেই দিনটির কথা চিন্তা করে আমার মন আনন্দে ভরে উঠতো; আঙুল দিয়ে বানান করে করে কথা বলার চেয়ে মুখ দিয়ে কথা বলা যে কত সহজ তা দেখতে পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এর পর আমার নিজের ভাবপ্রকাশের জন্য অঙ্গুলি-বর্ণমালার ব্যবহার আমি একেবারে ছেড়ে দিই। কিন্তু মিস্ সালিভান ও জনকয়েক বন্ধু আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য এখনও এই বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকেন, কারণ ওষ্ঠসঞ্চালন অনুভব করার চেয়ে এই পদ্ধতি অনেক বেশী দ্রুত ও সুবিধাজনক।

আমাদের এই অঙ্গুলি-বর্ণমালা ব্যবহারের বিধিটি বোধ হয় এইখানে একটু বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। কারণ যাঁরা আমাদের চেনেন না এই ব্যাপারটি তাঁদের কাছে বেশ রহস্যময় বলে মনে হয়। আমার সঙ্গে যিনি কথা বলেন বা আমাকে কোন বই পড়ে শোনান তিনি কথাগুলি আমার হাতে বানান করে দেন। বধির ব্যক্তিদের দ্বারা সাধারণতঃ ব্যবহৃত এক হাতের অঙ্গুলি-বর্ণমালা এই জন্য ব্যবহার করা হয়। বক্তার হাতের উপর আমার হাতখানি আমি এমন আলতো ভাবে রাখি যেন তাঁর অঙ্গুলি-সঞ্চালনে কোন ব্যাঘাত না হয়। তাঁর হাতের অবস্থান আমি প্রায় চোখে দেখার মত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। আপনারা যেমন পড়বার সময় প্রতিটি অক্ষর পৃথক পৃথক করে দেখেন না, আমিও তেমনি সেগুলিকে

পৃথকভাবে অনুভব করি না। অনবরত অভ্যাসের ফলে আঙুলগুলি খুব নমনীয় হয়ে ওঠে। সুদক্ষ টাইপিস্ট যত দ্রুত টাইপ করতে পারেন আমার কয়েকজন বন্ধু প্রায় তত দ্রুত আঙুল দিয়ে কথা বানান করে যেতে পারেন। লেখার সময় যেমন কেউ সচেতনভাবে বানান করে করে লেখে না, তেমনি এক্ষেত্রেও তা কেউ করে না।

মুখ দিয়ে কথা বলা আয়ত্ত করার পর আমি বাড়ী যাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। অবশেষে সেই রকম সুখের মুহূর্ত্তটি এসে পড়লো। বাড়ী ফিরবার পথে আমি সর্বক্ষণ মিস্ সালিভানের সঙ্গে কথা বলেছি,—শুধু কথা বলবার আনন্দে নয়, শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমার বাগ্‌ভঙ্গির উন্নতি সাধন করবো এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। আমি প্রায় কিছু জানতে পারবার আগেই রেলগাড়ী টাস্কাম্বিয়া স্টেশনে এসে থামলো। চেয়ে দেখি, বাড়ীর সবাই প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। মা আমাকে নির্বাক ভাবে বুকে চেপে ধরলেন ; আনন্দে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছিল। আমার মুখের প্রতিটি কথা তিনি সাগ্রহে শুনছিলেন। এখনও সেই স্মৃতি মনে জাগলে আমার চোখ জলে ভরে ওঠে। ছোট্ট মিল্‌ড্রেড আমার খালি হাতখানি ধরে তাতে চুম্বন করছিল আর ধেই ধেই করে নাচছিল। আর বাবা একটা বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে তাঁর হৃদয়ের স্নেহ ও গর্ব প্রকাশ করছিলেন। মনে হলো যেন আমার মধ্য দিয়ে আইজাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়ে উঠেছে : "তোমার সামনে সমস্ত পাহাড়-পর্বত গান গেয়ে উঠবে, মাঠের সব গাছপালা হাততালি দিতে থাকবে।"

চৌদ্দ

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আমার শৈশব-গগনের একমাত্র কালো মেঘ উদিত হয়ে তার সমস্ত আনন্দ-দীপ্তি আঁধার করে দিয়েছিল। আমার হৃদয় থেকে সকল সুখ নির্বাসিত হয়েছিল। এর পর অনেক—অনেকদিন ধরে আমাকে দ্বিধা, আশঙ্কা ও ভীতির মধ্যে বাস করতে হয়েছিল। বই পড়ে আর আমি কোন আনন্দ পেতাম না। এখনও সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা চিন্তা করতে আমার হৃদয় আতঙ্কে হিম হয়ে ওঠে। সমস্ত আপদের মূলে ছিল "হিমের রাজা" (Frost King) নামক একটি ছোট্ট গল্প। আমি এই গল্পটি লিখে পার্কিন্‌স্ অন্ধ-বিদ্যালয়ে মিঃ আনাগ্‌নসের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই ঘটনাটির সংগে সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্যাবলী আমি এখানে প্রকাশ করতে বাধ্য। আমার নিজের প্রতিও আমার শিক্ষয়িত্রীর প্রতি যাতে সুবিচার করা হয় সেই জন্যই আমি ঘটনাটি বর্ণনা করছি

কথা বলতে শেখার পর হেমন্তকালে আমি বাড়ীতে ছিলাম। এই সময়ে আমি গল্পটি লিখি। সাধারণতঃ আমরা "ফার্ণ কোয়ারি"-তে যতদিন থাকি সেবার তার চেয়ে বেশীদিন ছিলাম। আমরা যখন সেখানে, তখন মিস্ সালিভান একদিন ঝরে পড়বার আগে গাছের পাতার সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করে শোনান। এখন বুঝতে পারি, তাঁর এই বর্ণনা আমার মনে একটা গল্পের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছিল। গল্পটি নিশ্চয় আমাকে কখনও পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং নিজের অজ্ঞাতসারে আমি সেটি মনে করে রেখেছিলাম। আমি তখন ভেবেছিলাম, গল্পটি আমি "মনে থেকে বানিয়ে তুলছি।" ছেলে-মেয়েরা একথাটা হামেশাই বলে থাকে। গল্পের ঘটনাসূত্রগুলি মন থেকে

হারিয়ে যাবার আগেই আমি সাগ্রহে বসে পড়লাম গল্পটি লিখে ফেলবার জন্য। আমার চিন্তার ধারা বেশ স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হচ্ছিল; রচনাকার্যে খুব আনন্দ পাচ্ছিলাম। কথার পর কথা, ছবির পর ছবি দ্রুত আঙুলের ডগায় এসে পৌঁছুতে লাগলো; বাক্যের পর বাক্য রচনা করতে লাগলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে আমার ব্রেইল স্লেটের উপর লিখে ফেলতে লাগলাম। এখন যদি বিনা চেষ্টায় বহু কথা ও ছবি আমার মনে এসে উদয় হয়, তাহলে প্রায় নিশ্চিত ভাবেই ধরে নিয়ে থাকি যে সেগুলি আমার নিজস্ব সৃষ্টি নয়, পথে কুড়িয়ে পাওয়া অপরের জিনিস; অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখুনি তাদের বিদায় করে দিই। তখন আমি যা পড়তাম গভীর আগ্রহে তাই মনের মধ্যে গ্রহণ করতাম। কোনটা কার লেখা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না। এখনও আমি বই পড়ে-শেখা-জিনিস ও আমার নিজস্ব ধারণাগুলির মধ্যেকার সীমা-রেখা সম্বন্ধে সব সময়ের ঠিক নিশ্চিত হতে পারি না। বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞান অপরের চক্ষুকর্ণের ভিতর দিয়ে আমার মনে এসে পৌঁছায় বলেই বোধ হয় এমন হয়।

গল্প লেখা শেষ হয়ে গেলে আমি সেটি আমার শিক্ষয়িত্রীকে পড়ে শোনালাম। বিশেষ সুন্দর সুন্দর অংশগুলি পড়বার সময় মনে কেমন আনন্দ হচ্ছিল, মাঝে মাঝে দুই একটি কথার উচ্চারণ সংশোধনের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কি রকম বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম,—সব আমার স্পষ্ট মনে আছে। সান্ধ্য-ভোজনের সময় বাড়ীর সকলে সমবেত হলে গল্পটি তাঁদের পড়ে শোনানো হলো। আমি এত ভালো লিখতে পারি দেখে সবাই খুব অবাক হয়ে গেলেন। কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোন বই-এ গল্পটা পড়েছি কি না।

প্রশ্নটা শুনে আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ কেউ আমাকে কোনদিন গল্পটা পড়ে শুনিয়েছেন এমন কথা কিছুতেই আমি মনে করতে

পারি নি। প্রত্যুত্তরে আমি স্পষ্টই বলেছিলাম, "না না, এ গল্প আমার নিজের লেখা। মিঃ আনাগনসের জন্য আমি এটা লিখেছি।"

সুতরাং আমি গল্পটির একটি নকল করে ফেললাম এবং মিঃ আনাগনসের জন্মদিন উপলক্ষে সেটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, গল্পটির নাম যেন আমি "হেমন্তের পাতা" (Autumn Leaves) না রেখে "হিমের রাজা" (Frost King) রাখি। এ পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছিলাম। ছোট্ট গল্পটি আমি নিজ হাতে পোস্টাপিসে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম। যখন যাচ্ছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যেন আমি হাঁটছি না, উড়ছি। হায়! জন্মদিনের এই উপহার পাঠানোর জন্য আমাকে যে কি কঠোর শাস্তি পেতে হবে তা কি তখন স্বপ্নেও ভেবেছিলাম?

"হিমের রাজা" পড়ে মিঃ আনাগনস্ ভারী খুসি হলেন পার্কিন্‌স্ ইন্‌স্টিটিউশনের নানাবিধ কার্যবিবরণীর একটাতে তিনি গল্পটি ছেপে দিলেন এই আমার সুখের সপ্তম স্বর্গ; কিন্তু শীঘ্রই সেখান থেকে অধঃপতিত হয়ে আমাকে মর্ত্ত্যে এসে পড়তে হয়েছিল। আমি বস্টনে গিয়ে অল্প কিছু দিন থাকবার পরেই আবিষ্কৃত হলো যে, "হিমের রাজা"-র অবিকল অনুরূপ মিস মার্গারেট টি ক্যানবি রচিত "হিমের পরী" (The Frost Fairies) শীর্ষক একটি গল্প আমার জন্মের পূর্বে "বার্ডি ও তাহার বন্ধুগণ" (Birdie and His Friends) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প দুটির মধ্যে ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য এত বেশী ছিল যে, স্পষ্টই বোঝা গেল, মিস ক্যানবির গল্পটি কোন সময়ে আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল এবং আমার গল্পটি—তা থেকে চুরি করে লেখা। আমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে সকলের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম, তখন আমি বিস্ময়ে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কোন শিশুকে বোধ হয় কখনও তিক্ততার পেয়ালা আমার মত এমন নিঃশেষে পান

করতে হয় নি। নিজেকে আমি এক অতি লজ্জাকর অবস্থায় ফেলেছিলাম। যাঁদের আমি সব চেয়ে ভালোবাসতাম আমার কার্যের ফলে তাঁদের সততায়ও লোকের সন্দেহ জন্মেছিল। কিন্তু তবু এ সম্ভব হলো কি করে? "হিমের রাজা" লিখবার আগে হিম সম্বন্ধে আমি কোথায় কি পড়েছি মনে করবার চেষ্টায় মাথা ঘামিয়ে ঘামিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় "হিম-বুড়ো"-র (Jack Frost-এর) নামোল্লেখ ও "হিমের লীলা" (The Freaks of the Frost) নামক একটি শিশু-কবিতা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়লো না। এ কবিতাটি অন্ততঃ যে আমার রচনার কোথাও ব্যবহার করি নি তা আমি জানতাম।

মিঃ আনাগ্নেস্ গভীর মনোবেদনা পেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমে তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি আমার প্রতি বেশী বেশী করে সদয় ও কোমল ব্যবহার করতে লাগলেন; স্বল্পকালের জন্য দুর্দৈবের ছায়া অপসারিত হয়ে গেল। তাঁকে খুসি করবার জন্য আমি মনের দুঃখ ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলাম, ওয়াশিংটনের জন্মতিথি উৎসবের জন্য নিজেকে যথাসাধ্য সুন্দর ও সুশ্রী করে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। উপরে উল্লিখিত মর্মান্তিক সংবাদটি আমার কানে এসে পৌঁছুবার অল্প কিছুদিন পরেই এই উৎসব হবার কথা ছিল।

অন্ধ মেয়েরা এক ধরণের একটা নাট্যাভিনয় করবে স্থির হয়েছিল। তাতে আমার ধরিত্রীদেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা ছিল। চমৎকার ঢিলা পোষাক ভাঁজে ভাঁজে আমার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে ছিল, মাথায় ছিল হেমন্তের রঙীন পাতার মুকুট, পায়ের সামনে ছিল ফলের স্তূপ, আর হাতে ছিল শস্যের শিষ; সব আমার বেশ মনে আছে। কিন্তু নাট্যাভিনয়ের সমস্ত স্ফূর্তির অন্তরালে ভাবী অমঙ্গলের অশুভ ইঙ্গিত আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল।

উৎসবের আগের দিন রাত্রে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষয়িত্রী আমাকে "হিমের রাজা" সম্বন্ধে কি একটা প্রশ্ন করেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলছিলাম যে, মিস্ সালিভান আমাকে "হিমবুড়ো" ও তার অত্যাশ্চর্য কার্য-কলাপের কাহিনী বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। হঠাৎ তিনি আমার কোন একটা কথা ভুল বুঝে বসলেন। মিস্ ক্যান্‌বি রচিত "হিমের পরী" নামক গল্পের কথা আমার মনে ছিল, এই রকম একটা স্বীকারোক্তি তিনি আমার কথার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে করলেন। আমি প্রাণপণে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, তিনি ভুল করছেন। তথাপি তিনি গিয়ে তাঁর ধারণাটি আনাগ্‌নস্‌কে জানিয়ে দিলেন।

মিঃ আনাগ্‌নস্ আমাকে বড় ভালোবাসতেন। আমি তাঁকে ঠকিয়েছি ভেবে তিনি আমার নির্দোষ স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের কোন আবেদন নিবেদনই আর কানে তুললেন না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, অন্ততঃপক্ষে তাঁর মনে এই সন্দেহের উদয় হয়েছিল যে, মিস্ সালিভান ও আমি জেনে শুনে অপরের লেখা থেকে ভালো ভালো ভাব চুরি করে তাঁর প্রশংসা লাভের জন্য তাঁকে প্রতারণা করেছিলাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের দিয়ে গঠিত একটা অনুসন্ধান সমিতির সামনে আমাকে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। মিস্ সালিভানকে সেখান থেকে চলে যেতে বলা হলো। তারপর শুরু হলো জেরার পর জেরা। মনে হলো যেন আমার বিচারকেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, জোর করে আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেবেন যে, "হিমের পরী" গল্পটি আমাকে পড়িয়ে শোনানোর কথা আমার মনে ছিল। তাঁদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের মধ্যে আমি তাঁদের মনের সন্দেহ ও সংশয় অনুভব করছিলাম ; এও অনুভব করছিলাম যে, আমার একজন স্নেহময় বন্ধু তিরস্কার পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। এ সব চিন্তা কথায় প্রকাশ করে বলার ক্ষমতা অবশ্য তখন আমার ছিল না। আমার স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে রক্তের প্রবল

চাপ অনুভূত হচ্ছিল ; সংক্ষিপ্ত "হুঁ" "হাঁ" ছাড়া কোন কথাই প্রায় বলতে পারছিলাম না। সমস্ত ব্যাপারটাই যে একটা মারাত্মক ভুল এ জ্ঞানও আমার মনঃকষ্টের লাঘব করতে পারছিল না। অবশেষে যখন আমাকে ঘর ছেড়ে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো তখন আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম ; আমার শিক্ষয়িত্রীর স্নেহস্পর্শ বা বন্ধুবান্ধবদের সহৃদয় কথাবার্তা কিছুই আমি লক্ষ্য করি নি। এঁরা আমার সাহসের প্রশংসা করছিলেন ; বলছিলেন যে, আমার আচরণে তাঁরা গর্ব বোধ করছেন।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যে কান্না কেঁদেছিলাম, আশা করি তেমন কান্না কোন শিশুকে জীবনে কোনদিন কাঁদতে হয় নি। আমার শরীর যেন হিম হয়ে আসছিল ; মনে মনে এই চিন্তা করে সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম যে, সকালের আগেই বোধ হয় আমি মরে যাব। আজ মনে হয়, আরও বড় হবার পর যদি আমাকে এই দুঃখ সহ্য করতে হতো তাহলে বোধ হয় মন এমন ভাবে ভেঙে যেত যে, আর তা কখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারতো না। কিন্তু সেদিনকার সেই বিষাদময় দিনগুলির অধিকাংশ বেদনা ও সমস্ত তিক্ততা বিস্মৃতির দেবতা দুই হাতে জড়ো করে আমার মন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।

"হিমের পরী" গল্পটির কিংবা যে বই-এ এটি প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম মিস্ সালিভান জীবনেও শোনেন নি। ডাঃ গ্রেহাম বেল্-এর সাহায্যে তিনি সমস্ত ব্যাপারটি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। অবশেষে জানা গেল, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিস্ ক্যানবি রচিত "বার্ডি ও তাহার বন্ধুগণ" বই-এর এক খণ্ড মিসেস্ সোফিয়া সি হপকিন্সের বাড়ীতে ছিল। ঐ বৎসর আমরা ব্রুস্টার-এ গিয়ে তাঁর বাড়ীতে গ্রীষ্মাবকাশ যাপন করেছিলাম। মিসেস্ হপ্‌কিন্স পরে বইখানি খুঁজে পান নি। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন যে, সেই সময়ে মিস্ সালিভান কয়েকদিনের জন্য ছুটি নিয়ে চলে

যান। তখন তিনি আমাকে খুসি করার জন্য অনেক বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাতেন। অবশ্য আমারই মত, "বার্ডি ও তাহার বন্ধুগণ" পড়বার কথা তাঁরও কিছু মনে ছিল না; কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ঐ বই-খানা থেকেও তিনি আমাকে কিছু পড়ে শুনিয়েছিলেন। বইখানা কেন এখন পাওয়া যাচ্ছে না, এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, সম্প্রতি তিনি তাঁর বাড়ী বিক্রয় করে ফেলেছেন, এবং ঐ সঙ্গে পুরানো স্কুল পাঠ্য বই, রূপকথার বই, প্রভৃতি বহু শিশু পাঠ্য পুস্তকও বেচে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ "বার্ডি ও তাহার বন্ধুগণ" বইখানাও ঐ সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেছে।

তখন গল্পগুলির প্রায় কিছুই আমি বুঝতে পারি নি। কিন্তু ছোট একটি শিশুকে খুসি করবার জন্য এই সব নূতন নূতন শব্দের বানানই যথেষ্ট ছিল। বিশেষতঃ তখন নিজে কিছু করে আনন্দ পাবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যদিও এই গল্পগুলি পাঠ করা সংক্রান্ত একটা ঘটনাও আজ আমার মনে নেই; তথাপি আমি যে ঐ শব্দগুলি মনে রাখবার জন্য প্রবল চেষ্টা করেছিলাম সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। উদ্দেশ্য ছিল, আমার শিক্ষয়িত্রী ফিরে এলে তাঁকে দিয়ে সেগুলির মানে বুঝিয়ে নেওয়া। একটা কথা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই,—গল্পগুলির ভাষা আমার মস্তিষ্কে অবিস্মরণীয় ভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত একথা কেউ জানতে পারে নি; আমি নিজে তো কিছুইই জানতে পারি নি।

মিস সালিভান ফিরে এলে তাঁকে আমি "হিমের পরী" সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি এসেই Little Lord Fauntleroy বইখানি পড়ে শোনাতে আরম্ভ করেছিলেন, আমিও আর সব কথা ভুলে শুধু এই বই এর কথাই ভাবতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, মিস্ ক্যান্‌বির গল্পটি আমাকে একবার পড়ে শোনানো হয়েছিল, এবং আমি তা ভুলে যাবার অনেকদিন পরে

সেটি এত স্বাভাবিক ভাবে আমার মনের মধ্যে আবার এসে আবির্ভূত হয়েছিল যে, তাকে অপর কোন মনের সৃষ্টি বলে আমার একবারও সন্দেহ হয় নি।

আমার এই দুর্দৈবের দিনে স্নেহ ও সহানুভূতির বহু বার্তা আমার কাছে এসে পৌঁছেছিল। যে সব বন্ধুবান্ধবদের আমি সবচেয়ে ভালোবাসতাম আজও তাঁরা সবাই আমার আপন জন হয়ে রয়েছেন,—শুধু একজন ছাড়া।

মিস্ ক্যান্‌বি নিজে সহৃদয়তার সঙ্গে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "একদিন তুমি নিজের মনের ভিতর থেকে একটা শ্রেষ্ঠ গল্প রচনা করবে; সে গল্প বহুলোককে সান্ত্বনা দেবে, সাহায্য করবে"—কিন্তু এই সদয় ভবিষ্যদ্বাণী আমার জীবনে সফল হয়নি। শুধু কথা নিয়ে খেলার আনন্দের জন্য আর আমি কোনদিন কথার পর কথা সাজাই নি। বস্তুতঃ এরপর থেকে একটা ভয় আমাকে সর্বদাই উৎপীড়িত করে আসছে। সেটা এই: আমি যা লিখছি তা বোধ হয় আমার নিজের কথা নয়। এরপর বহুদিন ধরে, এমন কি মায়ের কাছেও যখন কোন চিঠি লিখতে বসতাম, তখন মাঝে মাঝে একটা আকস্মিক আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়তাম। তখন আমি বার বার বাক্যগুলি বানান করে দেখতাম, সেগুলি যে কোন বই-এ আমি পড়িনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাইতাম। মিস্ সালিভান যদি ক্রমাগত আমাকে উৎসাহিত না করতেন তাহলে বোধ হয় আমি লিখবার চেষ্টাই একেবারে ছেড়ে দিতাম।

এর পর আমি "হিমের পরী" গল্পটি পড়েছি। আর যে সব চিঠিপত্র লিখবার সময় মিস্ ক্যান্‌বির অন্যান্য ভাব আমি ব্যবহার করেছিলাম সেগুলিও আবার পড়ে দেখেছি। এর একখানি চিঠি মিঃ আনাগ্‌নস্‌কে লেখা; তারিখ—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর। বইখানিতে যেরকম ভাব ও ভাষা আছে এই চিঠিতেও ঠিক তাই আছে। এই সময়ে আমি

"হিমের রাজা" লিখছিলাম। এই চিঠিতে এবং আরও অনেক চিঠিতে আমি এমন সব শব্দসমষ্টি ব্যবহার করেছিলাম যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সময়ে আমার মন ঐ গল্পের রূপে ও রসে ওতপ্রোত হয়েছিল। এই চিঠিতে আমি বর্ণনা করেছি যেন আমার শিক্ষয়িত্রী হেমন্তের স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষপত্র সম্বন্ধে আমাকে বলছেন, "হ্যাঁ, এরা এত সুন্দর যে, গ্রীষ্মের অন্তর্ধানের দুঃখে এদের দেখে আমরা সান্ত্বনা পাই।"—ভাবটি কিন্তু সরাসরি মিস্ ক্যান্বির গল্প থেকে নেওয়া।

আমার যা পড়ে ভালো লাগতো তাকে নিজস্ব করে নেবার এবং পরে তাই নিজের জিনিস বলে চালানোর এই অভ্যাসের পরিচয় আমার প্রথম জীবনের অনেক চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যেও পাওয়া যায়। গ্রীস ও ইতালীর প্রাচীন নগরগুলি সম্বন্ধে একবার আমি একটা প্রবন্ধ রচনা করি। এতে আমি যে সব বর্ণাঢ্য বর্ণনা দিয়েছিলাম সেগুলি ঈষৎ অদল বদল করে নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করা। কোন্ কোন্ বই থেকে সেগুলি সংগ্রহ করেছিলাম তা আজ ভুলে গিয়েছি। প্রাচীন যুগের প্রতি মিঃ আনাগ্নসের প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ইতালি ও গ্রীস সম্পর্কিত সর্বপ্রকার সুভাষিতাবলী সম্বন্ধে তাঁর সোৎসাহ রসবোধের কথা আমার জানা ছিল। সুতরাং আমি যত বই পড়েছিলাম তার মধ্যে তাঁকে খুসি করবার মত কাব্য ও ইতিহাস যেখানে যা ছিল সব আমি খুঁটিয়ে সংগ্রহ করেছিলাম। নগর সম্বন্ধীয় আমার এই রচনাটির বিষয়ে মিঃ আনাগ্নস্ বলেছিলেন, "এই সব ভাব মূলতঃ কাব্যরসাত্মক।" কিন্তু একটি এগার বছর বয়সের অন্ধ ও বধির বালিকা এই ভাবগুলি নিজে উদ্ভাবন করেছে, একথা তিনি কি করে ভাবলেন তা আমি বুঝতে পারি না। তথাপি আমি এই সব ভাবের মৌলিক স্রষ্টা নই বলে আমার সেই ছোট্ট রচনাটির যে কোন গুণই ছিল না তা আমি মানতে রাজি নই।

প্রবন্ধটি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, নানা সুন্দর সুন্দর কাব্যধর্মী ভাব সুস্পষ্ট ও প্রাণচঞ্চল ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল।

এই সব প্রাথমিক রচনা ছিল মনের ব্যায়াম স্বরূপ; সমস্ত তরুণ ও অনভিজ্ঞ লোকেরা যেমন করে শেখে, আমিও তেমনিভাবে আয়ত্তীকরণ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করতে শিখছিলাম। বই-এ যা পড়ে আমি আনন্দ পেতাম তাই, সজ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক স্মৃতিকোষে সঞ্চয় করে রাখতাম এবং নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী করে নিতাম। স্টিভেন্সন্ বলেছেন তরুণ লেখকের কাছে যা কিছু সব চেয়ে প্রশংসনীয় বলে মনে হয়, তাই সে সহজাত প্রেরণার বশেই অনুকরণ করতে শুরু করে দেয়; তার প্রশংসাও অতি বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সঙ্গে পাত্র পরিবর্তন করতে থাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদেরও বৎসরের পর বৎসর ধরে এইভাবে সাধনা করতে হয়। তবেই তাঁরা শিখতে পারেন, মনের প্রত্যেকটি অলিগলি দিয়ে যে লক্ষ লক্ষ কথা ভিড় করে এসে জড়ো হয়, কি করে তাদের সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো যায়।

সসঙ্কোচে স্বীকার করছি, আমি এখনও এই প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করতে পারি নি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সব সময়ে আমি আমার নিজের চিন্তা আর বই-এ পড়া জিনিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি না, কারণ আমি যা পড়ি তাই আমার মনের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। কাজেই যখন আমি লিখি তখন প্রায় সব সময়েই একটা জগাখিচুড়ি জিনিস সৃষ্টি করে বসি। তার সঙ্গে আমার হাতে-তৈরি একটা নানা রঙের তালি-জোড়া চাদরের সাদৃশ্যই সবচেয়ে বেশী। প্রথম সেলাই শিখবার পর আমি এই চাদরটা তৈরি করতে আরম্ভ করি। নানা টুকরা টাকরা জিনিস জুড়ে এটা তৈরি করা হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর রেশমী কাপড় ও ভেলভেটের টুকরাও ছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ জায়গাতেই ছিল মোটা খসখসে কাপড়ের

টুকরা, সেগুলো স্পর্শ করতে মোটেই ভালো লাগতো না। আমার রচনাবলীও এই ধরণের হয়ে থাকে ;—প্রধানতঃ নিজের নানা অর্জিত চিন্তা দিয়েই গড়া, কিন্তু মাঝে মাঝে যাঁদের লেখা পড়েছি সেই সব গ্রন্থকারদের কাছ থেকে ধার করা উৎকৃষ্টতর ভাব ও পরিণততর মতামতের চুমকি দিয়ে সাজানো। আমরা হলাম নানা সহজাত সংস্কার ও প্রবণতার সমষ্টি মাত্র। সুশিক্ষিত মনের ভাষার সাহায্যে আমাদের মনের বিশৃঙ্খল ভাব, অর্ধ অনুভূত চিত্তবৃত্তি ও অপরিণত চিন্তারাজি প্রকাশ করা খুবই শক্ত কাজ। আমাদের লেখার পথে আসল বাধাটা এইখানে বলেই আমার মনে হয়। চীনা ধাঁধাঁর কাটা ছবি জোড়া দেওয়া যে রকম কাজ, আমাদের পক্ষে লেখার চেষ্টাও অনেকটা সেই ধরণের কাজ। আমাদের মনের মধ্যে ভাবের একটা নক্সা আছে ; কথা দিয়ে আমরা সেটা প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু কথাগুলি ঠিক জায়গায় বসতে চায় না, আর তাও যদি বা বসে, আসল নক্সার সঙ্গে তাদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু আমরা লেখার চেষ্টা ছাড়ি না, কারণ আমরা জানি অন্যেরা এই চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছে। আমরাই বা হার মানবো কেন ?

ষ্টিভেন্সন্ বলেছেন, "মৌলিকত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করা ছাড়া মৌলিকত্ব লাভের আর কোন উপায় নেই।" মৌলিকত্ব হয়তো আমি কোনদিনই লাভ করতে পারবো না, কিন্তু আমার আশা আছে, কোনদিন না কোনদিন আমি আমার এই কৃত্রিম পরচুলো পরা রচনা-পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে পারবো। সেইদিন বোধ হয় আমি আমার একান্ত নিজস্ব চিন্তা ও অভিজ্ঞতাগুলিকে কথায় প্রকাশ করতে পারবো। ইত্যবসরে আশা ও বিশ্বাস বজায় রেখে আমি নিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি ; "হিমের রাজা"-র তিক্ত স্মৃতি যাতে এই প্রচেষ্টায় বাধা না জন্মাতে পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই দুঃখকর অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো আমার কিছু লাভ হয়েছে। এর ফলে আমি সাহিত্য রচনা সম্পর্কীয় কয়েকটি সমস্যা

সম্বন্ধে চিন্তা করতে শিখেছি। একমাত্র আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই ঘটনার ফলে আমি আমার প্রিয়তম বন্ধু মিঃ আনাগ্নস্‌কে হারালাম।

Ladies' Home Journal পত্রিকায় আমার এই আত্মজীবনী প্রকাশিত হবার পর মিঃ আনাগ্নস্ মিঃ মেসি-কে লিখিত একখানি পত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, "হিমের রাজা" সংক্রান্ত ঘটনাটি যখন ঘটে তখন তিনি আমাকে নিরপরাধ বলেই বিশ্বাস করতেন। যে অনুসন্ধান সমিতির সামনে আমাকে হাজির করা হয়েছিল তাতে আটজন লোক ছিলেন,—চারজন অন্ধ ও চারজন চক্ষুষ্মাণ। এঁদের চারজন নাকি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মিস্ ক্যান্‌বির গল্পটি যে আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল সেকথা আমার মনে ছিল, অপর চারজন নাকি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছিলেন। মিঃ আনাগ্নস্ বলেছেন, যাঁরা আমার অনুকূলে মত দিয়েছিলেন তিনি তাঁদের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন।

সত্য কথা যাই হোক না কেন, মিঃ আনাগ্নস্ যে পক্ষেই ভোট দিয়ে থাকুন না কেন,—যে ঘরের মধ্যে তিনি আমাকে এতবার কোলে নিয়ে বসেছেন, সহস্র ব্যস্ততা সত্ত্বেও এতবার সেখানে বসে আমার সঙ্গে খেলা করেছেন, সেই ঘরে প্রবেশ করে যখন আমি দেখতে পেলাম, ঘরের ভিতর যাঁরা বসে আছেন তাঁরা আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখছেন, তখন যেন আমি ঘরের সমগ্র আবহাওয়ায় একটা প্রতিকূলতা ও ভীতি-প্রদর্শনের আভাস অনুভব করলাম। এ অনুভূতি যে মিথ্যা নয় পরের ঘটনায় তা প্রমাণিত হয়েছে। এর পর দু'বছর এ রকম মনে হয়েছিল যে, তাঁর মতে আমি ও মিস্ সালিভান নিরপরাধ। তারপরে স্পষ্টতঃই তিনি এই অভিমত প্রত্যাহার করেন,—কেন তা আমি জানি না। অনুসন্ধান কার্যের কোন বিস্তারিত বিবরণ আমি জানতে পারি নি। আমার সেই "আদালতের" যে সব সদস্য আমার সঙ্গে কথা বলেন নি তাঁদের নাম পর্যন্ত আমি কোনদিন জানতে পারি নি। আমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠে-

ছিলাম যে, আমার পক্ষে কিছু লক্ষ্য করা অসম্ভব ছিল ; এত ভীত হয়ে পড়ে ছিলাম যে, কোন প্রশ্ন করতেও পারি নি। সত্য কথা বলতে কি, আমি কি বলছি বা আমাকে কি বলা হচ্ছে কিছুই তখন আমার বোধগম্য হয় নি।

"হিমের রাজা" সংক্রান্ত ঘটনার এই বর্ণনাটি আমি দিলাম, কারণ আমার জীবন ও শিক্ষার ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। তা ছাড়া আমি চাই না যে, এ নিয়ে আর কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়। নিজের সাফাই গাইবার অথবা অপর কারও উপর দোষারোপ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা মনে পোষণ না করে, আমি যতদূর জানি, সমস্ত তথ্যই এখানে প্রকাশ করে বললাম।

পনেরো

"হিমের রাজা" সংক্রান্ত ঘটনার পরবর্তী গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল আমি আমার পরিবারের সঙ্গে আলাবামায় কাটাই। সেবারকার ঘরে ফেরার কথা মনে হলে এখনও আমার আনন্দ হয়। সর্বত্র তখন ফুলের কুঁড়ি দেখা দিয়েছে, ফুল ফুটে উঠেছে। আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ। "হিমের রাজা"-র কথা তখন ভুলে গিয়েছি।

হেমন্তের লাল ও সোনালী রঙের পাতার রাশি যখন মাটিতে ঝরে পড়েছে, যে কস্তুরী-সুরভিত দ্রাক্ষাকুঞ্জ নি উদ্যান প্রান্তের কুঞ্জবনটি ছেয়ে ফেলেছিল সেগুলি যখন সূর্যের উত্তাপে স্বর্ণাভ পিঙ্গলবর্ণ হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে —"হিমের রাজা" লিখবার এক বৎসর পরে—আমি আমার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখতে আরম্ভ করলাম।

তখনও আমি যা লিখতাম তাই নিয়ে সাবধানতার বাড়াবাড়ি করতে

অত্যন্ত ছিলাম। আমি যা লিখছি তা হয়তো আমার একান্ত নিজস্ব বস্তু নাও হতে পারে, এই চিন্তা আমাকে সর্বদা উৎপীড়িত করতো। আমার এই আশঙ্কার কথা আমার শিক্ষয়িত্রী ব্যতীত আর কেউ জানতেন না। অদ্ভুত একটা সঙ্কোচের বাধার ফলে আমি কখনও "হিমের রাজা"-র উল্লেখ করতাম না। কথা বলতে বলতে সহসা যদি কোন চমৎকার ভাব আমার মনে এসে উদয় হতো, আমি প্রায়ই আমার শিক্ষয়িত্রীর হাতে মৃদু স্পর্শে বানান করে বলে উঠতাম, "এটা আমার ভাব কিনা ঠিক জানি না।" আবার কখনও বা একটা অনুচ্ছেদ লিখতে লিখতে মাঝখানে থেমে গিয়ে মনে মনে ভাবতাম, "আচ্ছা, ধর যদি প্রমাণ হয়ে যায়, এই সব কথা বহুদিন আগে আর কেউ লিখে গেছে, তাহলে কি হবে?" একটা অযৌক্তিক ভীতি যেন আমার হাত চেপে ধরতো, আর আমি সেদিন কিছু লিখতে পারতাম না। এখনও আমি মাঝে মাঝে সেই রকম অস্বস্তি ও অশান্তি অনুভব করি। মিস্ সালিভান আমাকে সান্ত্বনা দিতেন, যত রকমে পারেন আমাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমাকে লাভ করতে হয়েছিল তা আমার মনের উপর একটা চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এর পূর্ণ তাৎপর্য আমি এখন সবেমাত্র একটু একটু বুঝতে আরম্ভ করেছি। আমার শিক্ষয়িত্রী আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করেছিলেন, Youth's Companion নামক পত্রিকার জন্য আমার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে। তাঁর আশা ছিল, এর ফলে আমার আত্ম-বিশ্বাস ফিরে আসবে। আমার তখন বয়স বারো বছর। এই ছোট্ট কাহিনীটি রচনার জন্য আমাকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার কথা যখন ভাবি তখন মনে হয়, এই কাজটি থেকে পরে যে শুভফল উৎপন্ন হয়েছিল ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সাহায্যে নিশ্চয় তা তখনই আমি জানতে পেরেছিলাম, নইলে কখনই আমি এ কাজে সাফল্য লাভ করতে পারতাম না।

সসঙ্কোচে, ভয়ে ভয়ে, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। শিক্ষয়িত্রী আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তিনি জানতেন, আমি যদি ধৈর্য ধরে কাজ করে যেতে পারি তাহলেই আমি আমার মনকে সামলে নিতে পারবো, মানসিক ক্ষমতাগুলিকে আবার আয়ত্তে আনতে পারবো। "হিমের রাজা" সংক্রান্ত ঘটনাটি পর্যন্ত আমি শিশুসুলভ চিন্তাহীন জীবন যাপন করেছিলাম। কিন্তু এইবার আমি আমার মনের ভিতরকার কথা চিন্তা করতে শুরু করলাম; চোখ দিয়ে দেখা যায় না এমন সব জিনিস দেখতে শুরু করলাম। ক্রমশঃ আমি সেই নিদারুণ অভিজ্ঞতার উপচ্ছায়ার বাইরে চলে এলাম; পরীক্ষার ফলে মন আমার তখন নির্মলতর হয়ে উঠেছে, জীবনকে আরও ভালো করে চিনতে শিখেছি।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের বিশেষ বিশেষ ঘটনা হলো প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ডের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে আমার ওয়াশিংটন যাত্রা, এবং তারপর নায়াগ্রা ভ্রমণ ও বিশ্বমেলা দর্শন। এর ফলে আমার লেখাপড়ায় ক্রমাগত ব্যাঘাত ঘটেছিল; মাঝে মাঝে একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে কিছুই লেখাপড়া করতে পারি নি। সুতরাং এই সময়কার লেখাপড়ার কোন ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আমরা নায়াগ্রা দেখতে যাই। নায়াগ্রার যে অংশটি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত তার উপরকার অন্তরীপাকৃতি ভূখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যখন আমি বায়ুমণ্ডলের স্পন্দন ও পৃথিবীর কম্পন অনুভব করলাম, তখন আমার মনের ভাব যে কি হয়েছিল তা কথায় বর্ণনা করা খুবই কঠিন।

নায়াগ্রার বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী ও সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করেছিল, একথা অনেকের কাছেই খুব আশ্চর্য বলে মনে হয়। তাঁরা প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই সৌন্দর্যের বা ওই সঙ্গীতের তোমার কাছে কি অর্থ আছে? তুমি তো তীরভূমির উপর তরঙ্গের আবর্তন দেখতে পাও

না, তাদের গর্জন শুনতে পাও না! তোমার কাছে এ সবের অর্থ কি?"
খুব সুস্পষ্টভাবেই আমার কাছে এ সবের গভীর অর্থ আছে। আমি যেমন ভালোবাসা বা ধর্ম বা সততার গভীরতা বা সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারি না, তেমনি এ সবের অর্থেরও আমি গভীরতা বা সংজ্ঞা নির্নয় করতে পারি না।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মিস্ সালিভান ও আমি ডাঃ আলেক্জাণ্ডার গ্রেহাম বেল্এর সঙ্গে বিশ্বমেলা দেখতে যাই। সেই দিনগুলির স্মৃতি অবিমিশ্র আনন্দের স্মৃতি। আমার সহস্র শিশুসুলভ কল্পনা তখন মনোহর বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। প্রতিদিন কল্পনার সাহায্যে আমি একবার করে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে আসতাম। পৃথিবীর নানা সুদূরতম প্রান্ত থেকে নিয়ে আসা বহু বিচিত্র জিনিষ আমি দেখতাম। আশ্চর্য আশ্চর্য আবিষ্কার, শিল্প ও নৈপুণ্যের নানা মূল্যবান নমুনা, মানব-জীবনের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যাদি,—সব সত্য সত্যই আমার আঙুলের তলায় এসে পড়তো।

মেলার "মিড্ওয়ে প্লেজার্স্" নামক অংশটিতে বেড়াতে আমার বড় ভালো লাগতো। এত রকমের বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস দিয়ে স্থানটি বোঝাই ছিল যে, সেটিকে যেন আরব্যোপন্যাসের জগৎ বলে মনে হতো। শিবমূর্তি ও গজানন-দেবমূর্তি-শোভিত একটি অদ্ভুত বাজারের দৃশ্য এখানে সাজানো ছিল। যে ভারতবর্ষের কথা আমি বই-এ পড়েছি তাকে এর মধ্যে দেখতে পেতাম। বহু মস্জিদ ও উষ্ট্রশ্রেণী সমন্বিত কায়রো সহরের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিও এখানে ছিল; তার মধ্যে যেন সমগ্র পিরামিডের দেশটি কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল। আর একদিকে ছিল ভিনিস নগরীর সন্নিহিত সামুদ্রিক উপহ্রদ। প্রতি সন্ধ্যায় যখন নগরী ও ফোয়ারাগুলি আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হতো, আমরা এই উপহ্রদে নৌকায় চড়ে বেড়িয়ে বেড়াতাম। এই ছোট নৌকা-

খানি থেকে একটু দূরে একখানি ভাইকিং রণতরী ছিল। আমি একদিন তার উপরেও গিয়ে উঠেছিলাম। এর আগে একবার বস্টনে আমি একখানি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজে চড়েছিলাম। ভাইকিং রণতরীতে নাবিকেরাই ছিল সর্বেসর্বা। নাবিকেরাই পোত পরিচালনা করতো, ঝড়ে ও শান্ত সমুদ্রে সমান নির্ভীক ও অবিচলিত থাকতো, "আমরা সমুদ্রের সন্তান"--কেউ তাদের এই রণহুঙ্কারের পুনরুক্তি করলে তখুনি তার পশ্চাদ্ধাবন করতো, দেহের শক্তি ও মগজের বুদ্ধি দিয়ে লড়াই করতো। তারা ছিল আত্মনির্ভর-শীল ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ; আধুনিক যুগে নাবিকেরা যেমন চেতনাহীন কলকব্জার পিছনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তারা তা হয় নি। এই সব ব্যাপার আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম। সব সময়ে এই হয়ে থাকে; "মানুষেই শুধু মানুষের সবচেয়ে আগ্রহের বস্তু।"

এই জাহাজখানা থেকে খানিকটা দূরে "সান্টা মারিয়া" জাহাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছিল। আমি এটিও পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। জাহাজের কাপ্তেন আমাকে কলাম্বাসের কেবিন ও ডেস্ক্ দেখালেন। ডেস্কের উপর একটি বালুঘড়ি বসানো ছিল। এই ছোট্ট যন্ত্রটি আমার মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ এর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে পড়ছিল সেই নৌযাত্রী মহাবীরের কথা। তাঁর সঙ্গের লোকেরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাঁর জীবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে, আর তিনি বসে বসে দেখছেন একটি একটি করে বালুকণা ঝরে পড়ছে। কি গভীর ক্লান্তিতে সেদিন তাঁর মন ভরে উঠেছিল!

বিশ্বমেলার প্রেসিডেন্ট মিঃ হিগিনবটম্ অনুগ্রহ করে আমাকে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি স্পর্শ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমিও অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে মেলার সমস্ত ঐশ্বর্য আঙুল দিয়ে দিয়ে পরখ করে দেখছিলাম। এমনি আগ্রহের সঙ্গেই বোধ হয় পিজারো পেরুর ধনভাণ্ডার অধিকার

করেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের এই শুভ্রালোকিত নগরীটি যেন একটা স্পর্শ-যোগ্য বর্ণবৈচিত্র্য যন্ত্র। প্রত্যেকটি জিনিস, বিশেষ করে ফরাসীদেশীয় ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি, আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। এগুলি এত জীবন্ত যে, আমার মনে হয়েছিল যেন শিল্পী কতকগুলি স্বর্গীয় স্বপ্ন ধরে সেগুলিকে পার্থিব রূপের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছেন।

উত্তমাশা অন্তরীপের প্রদর্শনী দেখে আমি খনি থেকে হীরক সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিলাম। যখনই সম্ভব হতো, যন্ত্রপাতি চলবার সময় আমি সেগুলি স্পর্শ করে দেখতাম। কি করে হীরক ওজন করা হয়, কাটা হয় ও পালিস করা হয়—এইরূপে সে সম্বন্ধে আমি বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলেছিলাম। ঘোয়ানি জলের মধ্যে খুঁজে খুঁজে আমি নিজেই একখানা হীরক পেয়েছিলাম। সবাই বলেছিল যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সত্যকার হীরক এই একখানি মাত্র পাওয়া গেল।

ডাঃ বেল্ আমাদের সঙ্গে সব জায়গায় যেতেন এবং তাঁর নিজস্ব অনুপম ভঙ্গিতে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক জিনিসগুলি আমাকে বর্ণনা করে শোনাতেন। বিদ্যুৎ-প্রদর্শনীর গৃহে আমরা টেলিফোন, গ্রামোফোন, অটোফোন ও অন্যান্য উদ্ভাবিত যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। দূরত্বকে অগ্রাহ্য করে ও সময়ের বাধা ডিঙিয়ে কি উপায়ে তারের ভিতর দিয়ে বার্তা প্রেরণ করা যায় এবং কি উপায়ে প্রমিথিউসের মত আকাশ থেকে আগুন টেনে নামানো যায় ডাঃ বেল্ আমাকে তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নৃতত্ত্ব-বিভাগটিও আমরা দেখতে যেতাম। প্রাচীন মেক্সিকোর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ জিনিসগুলি বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতো। এই সব অমার্জিত পাথরের অস্ত্রশস্ত্রই অনেক সময় এক একটা বিগত যুগের একমাত্র নিদর্শন হয়ে টিকে থাকে। এইগুলি নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখতে আমি ভাবতাম, প্রকৃতির শিক্ষাদীক্ষাহীন আদিম সন্তান-দের হাতে গড়া এই সব সাধারণ বস্তু অনেক সময় চিরকাল টিকে থাকে, কিন্তু

রাজারাজড়া ও জ্ঞানীগুণীদের কীর্তিস্তম্ভ গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশিয়ে যায় মিশরের মামিগুলিও আমার কাছে বিশেষ কৌতূহলের বস্তু বলে মনে হতো, কিন্তু এগুলিকে স্পর্শ করতে আমার সঙ্কোচ হতো। মানবজাতির প্রগতি সম্বন্ধে পরে আমি যা শুনেছি বা পড়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী শিখেছিলাম এই সব স্মৃতিচিহ্ন দেখে

এই সব অভিজ্ঞতার ফলে আমার শব্দভাণ্ডারে আরও অনেক নূতন নূতন শব্দ জমা হয়েছিল। বিশ্বমেলাদর্শনের এই তিনটি সপ্তাহ আমাকে এক লাফে অনেকখানি এগিয়ে দিল। এতদিন পর্যন্ত রূপকথা ও খেলনার প্রতি শিশু-সুলভ আকর্ষণ নিয়েই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম; এইবার কর্মক্ষেত্ররূপা পৃথিবীর যথার্থ ও বাস্তব মূর্তিটি উপলব্ধি করবার সুযোগ পেলাম।

ষোল

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পূর্বে আমি নিজে নিজে অনেকটা এলোমেলোভাবে বহু বিষয়ের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছিলাম। আমি গ্রীস, রোম ও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস পড়েছিলাম। উঁচু উঁচু অক্ষরে ছাপা একখানি ফরাসীভাষার ব্যাকরণ আমার ছিল; ফরাসী ভাষাও একটু একটু আমি আগে থেকেই জানতাম। নূতন নূতন যে সব শব্দ আমার নজরে পড়তো সেগুলি ব্যবহার করে এবং ব্যাকরণের আইন-কানুন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি যথাসম্ভব এড়িয়ে আমি মনে মনে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ রচনা করতাম। এ ছিল আমার একরকম খেলা। বইখানিতে সমস্ত অক্ষর ও ধ্বনির বর্ণনা দেওয়া ছিল। সুতরাং আর কারও সাহায্য না নিয়ে আমি ফরাসী ভাষার উচ্চারণ আয়ত্ত করবারও চেষ্টা করেছিলাম। অবশ্য এ ছিল

অতি সামান্য ক্ষমতার সাহায্যে মস্তবড় উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা। কিন্তু বৃষ্টির দিন চুপ করে বসে না থেকে এই কাজ নিয়ে আমি সময় কাটাতে পারতাম। ক্রমে ক্রমে ফরাসী ভাষায় আমার মোটামুটি দখল জন্মালো; আমি লা ফোঁতেনের "উপকথা," Le Medecin Malgre Lui ও Athalie-র কোন কোন অংশ পড়ে আনন্দ পাবার ক্ষমতা অর্জন করলাম।

আমার মুখের কথার উন্নতি সাধনের জন্যও আমি যথেষ্ট সময় ব্যয় করতাম। মিস্ সালিভানকে চেঁচিয়ে বই পড়ে শোনাতাম, আমার প্রিয় কবিদের রচনা থেকে মুখস্থ কাব্যাংশ আবৃত্তি করে শোনাতাম। তিনি আমার উচ্চারণ সংশোধন করে দিতেন, বাক্যাংশের উচ্চারণভঙ্গি ও উপযুক্ত স্থানে ঝোঁক দেওয়া শিখিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার বিশ্বমেলাদর্শনের ক্লান্তি ও উত্তেজনা কাটিয়ে উঠতে উঠতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস এসে পড়েছিল। তখন আমি নির্ধারিত সময়ে নিয়মিতভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলাম।

এই সময় মিস্ সালিভান ও আমি পেনসিলভানিয়ার অন্তর্গত হালটন নামক স্থানে মিঃ উইলিয়ম ওয়েড-এর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মিঃ আয়রনস্ নামে তাঁদের একজন প্রতিবেশী ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। স্থির হলো, তিনি আমাকে পড়াবেন। এখনও মনে আছে, তাঁর স্বভাবটি ছিল অতি মধুর, সংসারের অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর প্রচুর। প্রধানতঃ তিনি আমাকে ল্যাটিন ব্যাকরণ শেখাতেন, তবে মাঝে মাঝে পাটি-গণিত শিখতেও সাহায্য করতেন। পাটিগণিত আমার যেমন শক্ত তেমনি নীরস বলে মনে হতো। মিঃ আয়রনস্ আমাকে টেনিসনের In Memorium কবিতাটিও পড়িয়েছিলেন। এর আগে আমি বহু বই পড়েছি, কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কখনও কিছু পড়ি নি। এই প্রথম আমি কোন লেখকের বিশেষত্ব চিনতে শিখলাম; পরিচিত বন্ধুর হাতের চাপ

যেমন চেনা যায় তেমনি ভাবে কোন লেখকের রচনারীতিও চিনতে পারা সম্ভব তা জানতে পারলাম।

প্রথম প্রথম ল্যাটিন ব্যাকরণ পড়তে আমার একটু অনিচ্ছাই হতো। কথার মানে যখন সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, তখন প্রত্যেকটি নূতন কথাকে —বিশেষ্য, সম্বন্ধপদ, একবচন, স্ত্রীলিঙ্গ—এই ভাবে বিশ্লেষণ করা আমার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হতো। মনে হতো, তাহলে তো আমার পোষা বিড়ালটিকেও জানতে হলে এই ভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন বর্গ মেরুদণ্ডী, উপসর্গ, চতুষ্পদ; শ্রেণী, স্তন্যপায়ী, জাতি, মার্জারীয়, উপজাতি, বিড়াল; বিশেষ নাম, ট্যাবি! কিন্তু যতই ভাষার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলাম, ততই কৌতূহল বাড়তে লাগলো; ভাষার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করে ফেললো। এরপর আমি প্রায়ই ল্যাটিন ভাষা পড়া নিয়ে খেলা করতাম, পরিচিত কথা কয়টি বেছে নিয়ে তা থেকে একটা অর্থ বার করবার চেষ্টা করতাম। এ খেলার আনন্দ আমার এখনও বজায় আছে।

কোন ভাষার সঙ্গে যখন সদ্যমাত্র আমাদের পরিচয় হয় তখন যে সব চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী ভাবচিত্র ও ভাবাবেগের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাদের চেয়ে মনোহর জিনিস আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। কল্পনার খেয়ালে গঠিত ও রঞ্জিত নানা ভাব তখন অতি দ্রুত মনের আকাশ পার হয়ে চলে যেতে থাকে। পড়ার সময় মিস সালিভান আমার পাশে বসে থাকতেন, মিঃ আয়রনস্ যা বলতেন আমার হাতে বানান করে দিতেন, আমাকে নূতন নূতন কথা জুগিয়ে দিতেন। কেবল সিজারের Gallic war পড়তে আরম্ভ করেছি এমন সময় আমি আলাবামায় আমাদের বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

সতেরো

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শ্যাটাকোয়া-য আমেরিকায় বধির কথন-শিক্ষা সহায়তা সমিতির এক অধিবেশন হয়। আমি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে স্থির হয় যে, আমি নিউ ইয়র্ক নগরীর রাইট-হিউম্যাসন বধির বিদ্যালয়ে পড়তে যাব। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে মিস্ সালিভানকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখানে যাই। স্বরচর্চায় ও ওষ্ঠ-সঞ্চালন অধ্যয়ন বিদ্যায় সর্বোত্তম নৈপুণ্য লাভের জন্যই বিশেষ করে এই বিদ্যালয়টি বেছে নেওয়া হয়েছিল। দুই বৎসর আমি এই বিদ্যালয়ে ছিলাম। এই সময়ে আমি যে শুধু এই দুটি বিদ্যার চর্চাই করেছিলাম তা নয়, পাটিগণিত, প্রাকৃতিক ভূগোল, ফরাসী ভাষা ও জার্মাণ ভাষাও অধ্যয়ন করেছিলাম।

আমার জার্মান-শিক্ষক মিস্ রিমি অঙ্গুলি বর্ণমালা ব্যবহার করতে পারতেন। আমি অল্পসংখ্যক শব্দ অধিগত করার পর আমরা দু'জনে যখনই সুযোগ পেতাম জার্মাণ ভাষায় কথাবার্তা বলতাম। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি যা কিছু বলতেন সব আমি বুঝতে পারতাম। প্রথম বছরটি শেষ হবার পূর্বেই আমি Wilhelm Tell পড়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করলাম। বস্তুতঃ অন্যান্য সব পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে আমি জার্মাণ ভাষাতেই বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলাম। ফরাসী ভাষা এর চেয়ে অনেক বেশী শক্ত বলে মনে হতো। মাদাম অলিভিয়ে নাম্নী এক ফরাসী মহিলা আমাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতেন। তিনি অঙ্গুলি-বর্ণমালা জানতেন না; বাধ্য

হয়ে তাঁকে মুখের কথায় শিক্ষা দিতে হতো। তাঁর ওষ্ঠাধর সঞ্চালনও আমি ভালো বুঝতে পারতাম না। কাজেই জার্মাণ ভাষায় আমার যত দ্রুত উন্নতি হয়েছিল এ ক্ষেত্রে তত দ্রুত হয় নি। তথাপি আমি আর একবার Le Medecin Malgre Lui পড়ে ফেললাম। বইখানি খুবই কৌতুকজনক। কিন্তু Wilhelm Tell পড়ে আমি যত আনন্দ পেয়েছিলাম এ বই পরে তত পাই নি।

ওষ্ঠ-সঞ্চালন অধ্যয়ন ও কথা বলায় আমি যতখানি উন্নতি লাভ করতে পারবো বলে আমার শিক্ষকেরা ও আমি নিজে আশা করেছিলাম ততখানি আমার হয়নি। অন্য লোকজনের মত কথা বলবো—এই ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার শিক্ষকেরা বিশ্বাস করতেন যে, তা সম্ভব হবে। কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পুরোপুরি গিয়ে পৌঁছুতে পারি নি। খুব সম্ভব আমরা বড় বেশী উঁচুতে লক্ষ্য করেছিলাম; কাজেই ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। তখনও পাটিগণিত দেখলেই আমার মনে হতো যেন এর মধ্যে সহস্র ফাঁদ পাতা রয়েছে। আমি অনুমানের বিপজ্জনক সীমান্ত প্রদেশেই ঘোরাফেরা করতাম, যুক্তির প্রশস্ত উপত্যকায় নামতে চাইতাম না। এর ফলে আমার নিজের ও অন্যান্য অনেকের বহু কষ্ট পেতে হতো। যখন অনুমান করতাম না তখন চাইতাম এক লাফে সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুতে। এই দোষটি ও আমার নির্বুদ্ধিতা—দুই-এ মিলে আমার পাটিগণিত সংক্রান্ত অসুবিধা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এতখানি অসুবিধা ভোগ করা আমার উচিত হয়নি,—এর প্রয়োজনও ছিল না।

এই সব আশাভঙ্গের ফলে মাঝে মাঝে আমার মন খুব ভেঙে পড়তো বটে, কিন্তু আমার অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন, বিশেষ করে প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়ন, আমি অদম্য উৎসাহের সঙ্গেই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ওল্ড টেস্টা-

মেন্টের চিত্রধর্মী ভাষায় বলতে গেলে,—কি করে আকাশের চার কোণ থেকে বায়ুস্রোত প্রবাহিত করে দেওয়া হয়; কি করে পৃথিবীর সর্বপ্রান্ত থেকে বাষ্পরাশি আকাশে উঠে যায়; কি করে শিলাপ্রস্তর কেটে নদী তৈরি করা হয়; কি করে পাহাড়-পর্বতের শিকড় ছিঁড়ে সেগুলিকে উলটে ফেলা হয়; আর কি উপায়ে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল শক্তি সমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে—প্রকৃতির এই সব রহস্য অধিগত করতে পেরে মন আনন্দে ভরে উঠতো। নিউ ইয়র্কের দুটি বছর আমার বেশ সুখেই কেটেছিল; নিজের আনন্দের সঙ্গেই তাদের কথা আজ আমি স্মরণ করি।

বিশেষ করে আমার মনে আছে, প্রত্যহ আমরা সবাই মিলে সেণ্ট্রাল পার্কে যেতাম। সহরে এই একটি মাত্র অংশই আমার মনের মত ছিল। এই বিশাল নগরোদ্যান থেকে আমি যে আনন্দ পেতাম কোনদিন তার বিন্দুমাত্র কমতি হয় নি। প্রতিবার এই উদ্যানে প্রবেশ করে আমি এর বর্ণনা শুনতে ভালোবাসতাম। এর মধ্যে বহু বিভিন্ন দৃশ্য ছিল, এবং প্রত্যেকটি দৃশ্যই সমান মনোরম ছিল। ফলে, যে কয়মাস নিউ ইয়র্কে ছিলাম, প্রত্যেক দিন এই উদ্যানের সৌন্দর্য আমার কাছে নূতন বলে মনে হতো।

বসন্তকালে আমরা নানা চিত্তাকর্ষক স্থানে দল বেঁধে বেড়াতে যেতাম। হাড্সন নদীতে নৌকায় করে ভ্রমণ করতাম, কবি ব্রায়ান্টের কাব্যে কীর্তিত এই নদীর শ্যামল তীরভূমিতে যথেচ্ছ বিচরণ করতাম। জীবন্ত বৃক্ষ দিয়ে গড়া গ্রাম-বেষ্টনী সমূহের স্বাভাবিক বন্য সৌন্দর্যের মহিমা আমার বড় ভালো লাগতো। আমি যে সব জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল ওয়েস্ট পয়েণ্ট ও ওয়াশিংটন আরভিং-এর বাসভূমি ট্যারিটাউন। এই ট্যারিটাউনে গিয়ে আমি সেই বিখ্যাত "ঘুম কোটরের" মধ্যে ভ্রমণ করে এসেছিলাম।

যারা শুনতে পায় তারা জীবনে যে সব সুবিধা ভোগ করে থাকে কি করে তাঁদের ছাত্রছাত্রীরাও সেই সব সুবিধা লাভ করতে পারে; ছোট শিশুদের বেলায়, কি করে তাদের সামান্য দুই একটি প্রবৃত্তি ও নিষ্ক্রিয় স্মৃতির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করা যায়; যে বাধাবিঘ্নময় সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে এদের জীবন অবস্থিত কি উপায়ে তা থেকে এদের মুক্তি দেওয়া যায়,—রাইট-হিউম্যাসন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সর্বদা তারই নানা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যাবার পূর্বে আমার এই আনন্দালোক সমুজ্জ্বল দিনগুলি এক নিদারুণতম শোকের আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। বাবার মৃত্যু ব্যতীত এত বড় শোক আমি জীবনে আর কখনও পাই নি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বস্টন-নিবাসী মিঃ জন পি. স্পল্ডিং মারা যান। যাঁরা তাঁকে চিনতেন ও ভালোবাসতেন একমাত্র তাঁরাই ঠিক বুঝতে পারবেন আমার কাছে তাঁর বন্ধুত্বের মূল্য কি ছিল। মনোজ্ঞ অথচ অপ্রগল্ভ আচরণের দ্বারা তিনি জীবনে সবাইকে খুসি করতে পেরেছিলেন। মিস্ সালিভান ও আমার প্রতি তিনি বিশেষ স্নেহ ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করতেন। আমাদের কর্তব্যের পথ বহু বাধায় সমাকীর্ণ ছিল। কিন্তু যতক্ষণ আমরা তাঁর স্নেহময় উপস্থিতি অনুভব করতে পারতাম, যতক্ষণ বুঝতে পারতাম যে, আমরা কি করি না করি তার প্রতি তিনি উৎসুক আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে আছেন, ততক্ষণ আমরা কিছুতেই ভগ্নোদ্যম হতে পারতাম না। তাঁর তিরোধানে আমাদের জীবন ফাঁকা হয়ে গেল। সে ফাঁক আজও পূর্ণ হয় নি।

আঠারো

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে আমি কেম্‌ব্রিজ বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম।

শৈশবে যখন আমি একবার ওয়েলেস্‌লিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন সহসা একটা ঘোষণা করে আমার বন্ধু-বান্ধবদের অবাক করে দিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, "দেখো, একদিন আমি কলেজে পড়তে যাব,—কিন্তু আমি হার্ভার্ডেই পড়বো।" ওয়েলেসলি কলেজে পড়তে চাই না কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম যে, সেখানে শুধু মেয়েরা পড়ে। কলেজে পড়বার চিন্তা ক্রমে ক্রমে আমার মনে শিকড় গেড়ে বসলো, একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হলো। এই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়, বহু জ্ঞানবান ও হিতৈষী বন্ধুর দৃঢ় বিরোধিতা সত্ত্বেও মনস্থ করলাম, ডিগ্রীলাভের জন্য আমি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হবো। যখন আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে এলাম তখন এই ইচ্ছা দৃঢ় সঙ্কল্পে পরিণত হয়েছে। স্থির হলো, এইবার আমি কেমব্রিজে ভর্তি হবো। আমার শৈশবকালীন ঘোষণাকে সফল করে হার্ভার্ডে ভর্তি হবার পথে আপাততঃ আমি এর চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলাম না।

স্থির হলো যে, কেম্‌ব্রিজ বিদ্যালয়ে মিস্ সালিভান আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে যাবেন এবং শিক্ষকদের প্রদত্ত বক্তৃতা ও উপদেশ আঙুলের ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।

বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ব্যতীত আর কাউকে শিক্ষা দেবার অভিজ্ঞতা আমার বর্তমান শিক্ষকদের ছিল না। ওষ্ঠাধর সঞ্চালন পর্যবেক্ষণ ছাড়া আমারও তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার কোন উপায় ছিল না। আমার প্রথম বৎসরের পাঠ্যসূচী ছিল—ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংরাজি, জার্মান ভাষা, ল্যাটিন ভাষা, পাটিগণিত, ল্যাটিন রচনা এবং কখন সখনও দুই একটি প্রবন্ধ রচনা। এর আগে কখনও কলেজে ভর্তি হবার প্রস্তুতি হিসাবে নির্দিষ্ট ধরনের লেখাপড়া করি নি। কিন্তু মিস্ সালিভান পূর্বেই আমাকে ইংরাজিতে বেশ পোক্ত করে তুলেছিলেন। শীঘ্রই আমার শিক্ষকেরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, কলেজ কর্তৃক পাঠ্য হিসাবে নির্ধারিত বইগুলির সমালোচনামূলক অধ্যয়ন ব্যতীত এই বিষয়ে আমার আর কোন বিশেষ শিক্ষা বা উপদেশের প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া ফরাসী ভাষাতেও আমি বেশ একটু এগিয়ে ছিলাম এবং ছয় মাস ল্যাটিন ভাষার পাঠাভ্যাস করেছিলাম। কিন্তু যে বিষয়টি আমার সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ছিল সেটি হচ্ছে জার্মান ভাষা।

কিন্তু এই সকল সুবিধা সত্ত্বেও আমার বিদ্যার্জনের পথে কতকগুলি মারাত্মক বাধা ছিল। পাঠ্যপুস্তকগুলি অধিগত করবার জন্য যা যা জানা দরকার হতো সব আমার হাতে বানান করে দেওয়া মিস্ সালিভানের সাধ্যের অতীত ছিল। তাছাড়া আমার প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত পাঠ্যপুস্তকগুলি উঁচু উঁচু অক্ষরে ছাপিয়ে আনাও খুব শক্ত ছিল। লণ্ডন ও ফিলাডেলফিয়ার আমার হিতৈষী বান্ধবেরা এই কাজটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে সচেষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তা সম্ভব হতো না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে একই সময়ে যাতে আবৃত্তি করতে পারি সেই জন্য কিছুদিন ধরে আমাকে তো আমার ল্যাটিন পড়াগুলি নিজেই ব্রেইল হরপে টুকে নিতে হয়েছিল। শিক্ষকেরা কিছুদিনের মধ্যেই আমার মুখের অস্পষ্ট

ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন। এর পর তাঁরা সহজেই আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন ও আমার ভ্রম সংশোধন করে দিতে পারতেন। ক্লাসে বসে নোট নেওয়া বা প্রশ্নের উত্তর লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল; কিন্তু বাড়ীতে টাইপরাইটারের সাহায্যে আমি আমার সমস্ত রচনা ও অনুবাদ লিখে ফেলতাম।

মিস্ সালিভান প্রত্যেক দিন আমার সঙ্গে সব ক্লাসে যেতেন এবং শিক্ষকেরা যা যা বলতেন অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সমস্ত আমার হাতে বানান করে দিতেন। পড়বার সময় তিনি আমাকে নূতন নূতন কথা খুঁজে দিতেন। যে সব বই ও টীকা-টিপ্পনি আমার কাছে উঁচু অক্ষরে ছাপা ছিল না সেগুলি বার বার পড়ে আমাকে শোনাতেন। সে যে কি বিরক্তিকর একঘেয়ে খাটুনি,—ভাবলেও ভয় করে! জার্মান-শিক্ষয়িত্রী ফ্রাউ গ্রোটে ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ গিলম্যান—এঁরা দুজনেই শুধু আমাকে শিক্ষা দেবার জন্য অঙ্গুলি-বর্ণমালা শিখে নিয়েছিলেন। ফ্রাউ গ্রোটের বানান-পদ্ধতি যে কত মন্থর ও অসম্পূর্ণ তা তিনি নিজেই সবচেয়ে ভালো বুঝতেন। তথাপি মিস্ সালিভানকে একটু বিশ্রাম দেবার উদ্দেশ্যে করুণাপরবশ হয়ে সপ্তাহে দুদিন তিনি বিশেষ ভাবে আমাকেই শিক্ষা দিতেন; অশেষ কষ্ট স্বীকার করে তাঁর সমস্ত উপদেশ আমাকে বানান করে দিতেন। সকলেই সমান দয়ালু ছিলেন, সকলেই আমাদের সাহায্য করতে উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু শুধু একজনের হাতই আমার এই ভূতের খাটুনিকে সুমধুর করে তুলতে পারতো।

ঐ বৎসর আমি পাটিগণিত সমাপ্ত করলাম, দ্বিতীয় বার ল্যাটিন ব্যাকরণ পড়লাম এবং সিজারের Gallic War-এর তিনটি অধ্যায় শেষ করে ফেললাম। অংশতঃ অঙ্গুলিস্পর্শ দ্বারা এবং অংশতঃ মিস্ সালিভানের সাহায্যে জার্মান ভাষায় আমি পড়ে ফেললাম শিলারের Lied von der Glocke ও Taucher,

হাইনের Harzreise, ফ্রাইতাগের Aus dem Staat Friedrichs des Grossen, রিয়েলের Fiuch Der Schonheit, লেসিং-এর Minna von Barn helm ও গ্যেটের Aus meinem Leben. এই সব জার্মান বই, বিশেষতঃ শিলারের অপূর্ব গীতিকবিতাবলী, মহান ফ্রেডরিকের বিরাট কীর্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও গ্যেটের জীবন কাহিনী, পড়তে আমার অত্যন্ত ভালো লাগতো। Die Harzreise যখন ফুরিয়ে গেল তখন আমার বেশ মন খারাপ হয়েছিল। বইখানি চমৎকার চমৎকার রসিকতায় পরিপূর্ণ। তা ছাড়া এতে নানা মনোমুগ্ধকর বর্ণনাও আছে,—দ্রাক্ষালতাসমাচ্ছন্ন পাহাড়-পর্বতের বর্ণনা, সূর্যকরোজ্জ্বল বীচিবিভঙ্গময় মর্মর-মুখর তটিনী-সরিতের বর্ণনা, কিংবদন্তী ও উপাখ্যান রূপিনী কবিকল্পনাময় সুপ্রাচীন জগতের দুই অতিবৃদ্ধা ভগিনীর চরণস্পর্শপূত আরণ্য ভূখণ্ডের বর্ণনা। প্রকৃতির মধ্যে যারা হৃদয়ের "আবেগ, প্রেম ও আকাংক্ষার" পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় শুধু তারাই এমন বর্ণনা লিখতে পারে।

বছরের কিয়দংশ ধরে মিঃ গিলম্যান আমাকে ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমরা এক সঙ্গে শেক্সপীয়রের As You Like It. বার্কের Speech on Conciliation with America ও মেকলের Life of Samuel Johnson অধ্যয়ন করেছিলাম। ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে মিঃ গিলম্যানের উদার মতবাদ ও তাঁর সুনিপুণ ব্যাখ্যান আমার কাজকে অনেক বেশী সহজ ও প্রীতিকর করে দিয়েছিল। আমাকে যদি শুধু যান্ত্রিকভাবে টীকা-টিপ্পনি পড়ে ও ক্লাসে অল্প সময়ের মধ্যে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে কাজ চালাতে হতো তাহলে এমন হতে পারতো না।

রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা আর যত বই আমি পড়েছি তাদের সবার চেয়ে বার্কের বক্তৃতা আমার কাছে বেশী শিক্ষাপ্রদ বলে মনে হয়েছে। সেই উত্তেজনাময় যুগের বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মনও উদ্দীপিত হয়ে

উঠতো। দু'টি যুধ্যমান জাতির জীবন যে সব ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো তারা যেন ঠিক আমার সামনে এসে আবির্ভূত হতো। বাগ্মিতার প্রবল উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস তুলে বার্কের সুমহান ভাষণ যতই তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতো ততই আমার মন বিস্ময়ে ভরে উঠতো। আমাদের বিজয়লাভ ও তাঁদের লজ্জাকর পরাজয় সম্বন্ধে তাঁর এই সতর্কতামূলক ভবিষ্যদ্বাণী সম্রাট জর্জ ও তাঁর মন্ত্রিগণ একেবারে কানেই তুললেন না! কি করে এমন ব্যাপার সম্ভব হলো? তারপর তাঁর রাজনৈতিক দল ও জনগণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের যে সম্পর্ক ছিল তার শোচনীয় খুঁটিনাটি খবরগুলি আমি ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম। সত্য ও জ্ঞানের এই সব অমূল্য বীজ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কিনা নির্বুদ্ধিতা ও অসাধুতার সেই আগাছার জঙ্গলে! যত ভাবতাম ততই অবাক হয়ে যেতাম।

আর এক দিয়ে মেকলে-রচিত স্যামুয়েল জনসনের জীবনী আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। সেই যে নিঃসঙ্গ লোকটি, যিনি দরিদ্র লেখকজীবনের শত কষ্ট নীরবে সহ্য করেছিলেন, অথচ হাড়ভাঙা খাটুনি এবং শরীর ও মনের নানা অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও দুঃস্থ ও অবহেলিত মানুষ দেখলেই তাকে একটা মিষ্ট কথা বলতে, তার দিকে সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করে দিতে কখনও ভোলেন নি,—তাঁর কথা ভাবলেই আমার মন প্রশংসা ও সমবেদনায় ভরে উঠতো। তাঁর প্রতিটি সাফল্যে আমি পুলকিত হয়ে উঠতাম; তাঁর কোন দোষ ত্রুটি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। তাঁর যে দোষ ত্রুটি ছিল এতে আমি বিন্দুমাত্র বিস্ময় অনুভব করি নি; বিস্মিত হয়েছি এই ভেবে যে, তাঁর দোষত্রুটি তাঁর আত্মার মহত্ত্বকে ধ্বংস করতে বা খাটো করতে পারে নি। কিন্তু, মেকলের ভাষার চমৎকারিত্ব এবং অতি সাধারণ বস্তুকে নূতন করে চিত্তাকর্ষক রূপে উপস্থাপিত করবার প্রশংসনীয় ক্ষমতা সত্ত্বেও তার নিঃসন্দিগ্ধ মতামত আমাকে মাঝে মাঝে ক্লান্ত করে তুলতো। তা

ছাড়া পাঠকের মনকে অভিভূত করে ফেলবার জন্য তিনি যে ভাবে প্রায়ই সত্যকে বিসর্জন দিতেন, তার ফলে আমার মনে সব সময়েই একটা অবিশ্বাসের ভাব জেগে থাকতো। গ্রেট ব্রিটেনের ডেমস্থিনিসের বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে যে শ্রদ্ধার উদয় হতো তার সঙ্গে এই মনোভাবের অনেক পার্থক্য।

আমার সমবয়স্কা শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্না বালিকাদের সাহচর্য আমি জীবনে প্রথম উপভোগ করবার সুযোগ পেলাম এই কেম্‌ব্রিজ বিদ্যালয়ে। আর কয়েকজন বালিকার সঙ্গে আমি বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি মনোরম ভবনে বাস করতাম। মিঃ হাউয়েল্‌স্‌ একদা এই বাড়ীতেই বাস করতেন। এখানে আমরা গৃহবাসের সমস্ত সুযোগ সুবিধাই পেতাম। অন্য বালিকাদের সঙ্গে আমি নানা খেলায় যোগ দিতাম, এমন কি কানামাছি খেলা ও তুষার-ক্রীড়াতেও অংশ গ্রহণ করতাম। তাদের সঙ্গে আমি দীর্ঘ ভ্রমণে বেরুতাম, লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করতাম, এবং যে সব পাঠ্যাংশ ভাল লাগতো সেগুলি পরস্পরকে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতাম। বালিকাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে শিখেছিল। সুতরাং মিস্‌ সালিভানকে সব সময়ে তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করে আমাকে শোনাতে হতো না।

বড়দিনের ছুটিটা আমার মা ও ছোট বোন এসে আমার সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন। এই সময় মিঃ গিলম্যান অনুগ্রহ করে মিল্‌ড্রেডকে তাঁর বিদ্যালয়ে পড়বার অনুমতি দিলেন। সুতরাং মিল্‌ড্রেড আমার সঙ্গে কেম্‌ব্রিজেই রয়ে গেল। এর পরের ছ'মাস আমাদের খুব সুখে কেটেছিল; প্রায় কখনই আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতাম না। আমরা লেখাপড়ায় পরস্পরকে সাহায্য করতাম, পরস্পরের আমোদ-প্রমোদেও অংশ গ্রহণ করতাম। সেই দিনগুলির কথা মনে হলে মন আনন্দে ভরে ওঠে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত আমি র‍্যাডক্লিফ কলেজে ভর্ত্তি হবার জন্য প্রাথমিক পরীক্ষা দিই। আমি যে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেগুলি হচ্ছে এই,—প্রাথমিক ও উচ্চতর জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন, ইংরাজি এবং গ্রীক ও রোমান ইতিহাস; সর্বশুদ্ধ নয় ঘণ্টার প্রশ্ন। আমি সব বিষয়েই পাশ করেছিলাম; জার্মান ও ইংরাজিতে "অনার্স" পেয়েছিলাম।

আমি যখন পরীক্ষা দিই তখন যে পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এখানে সেটা একটু বুঝিয়ে দিলে বোধ হয় ভালো হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে মোট ষোল ঘণ্টার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাশ করতে হতো। এর মধ্যে বারো ঘণ্টার প্রশ্নকে বলা হতো প্রাথমিক, আর চার ঘণ্টার প্রশ্নকে বলা হতো উচ্চতর। এক একবারের পরীক্ষায় অন্ততঃ পাঁচ ঘণ্টার প্রশ্নে পাশ করতে হতো, নইলে পরীক্ষা নাকচ হয়ে যেত। হার্ভার্ডে প্রশ্নপত্র বিলি করা হতো বেলা নটার সময়; বিশেষ একজন বাহক সেগুলি র‍্যাডক্লিফ কলেজে নিয়ে আসতো। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী পরিচিত হতো তার নাম দিয়ে নয়, —একটা নম্বর দিয়ে। আমার নম্বর ছিল ২৩৩, কিন্তু আমি বাধ্য হয়ে টাইপরাইটার ব্যবহার করেছিলাম বলে আমার পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব হয় নি।

আমার পক্ষে একা এক ঘরে বসে পরীক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল; নইলে আমার টাইপরাইটারের আওয়াজ অন্য বালিকাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। মিঃ গিলম্যান অঙ্গুলিবর্ণমালার সাহায্যে সমস্ত প্রশ্ন-পত্রগুলি আমাকে পড়ে দিয়েছিলেন। আমার কাজে যাতে কেউ বিঘ্ন না ঘটায় সেইজন্য দরজায় একজন লোককে প্রহরী রাখা হয়েছিল।

প্রথম দিন আমি জার্মাণ ভাষার পরীক্ষা দিই। মিঃ গিলম্যান আমার পাশে বসে প্রথমে একবার সমগ্র প্রশ্নপত্রটি আমাকে পড়ে দিলেন, তারপর

আবার একটি একটি বাক্য করে আর একবার পড়ে দিলেন। তাঁর কথা আমি বেশ ভালো ভাবে বুঝতে পেরেছি এইটা প্রমাণ করবার জন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাষায় কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে গেলাম। প্রশ্নগুলি বেশ কঠিন ছিল। টাইপরাইটারে উত্তর লিখতে লিখতে আমি খুব মানসিক উদ্বেগ অনুভব করছিলাম। আমি যা লিখলাম মিঃ গিলম্যান তা বানান করে করে আমাকে পড়িয়েছিলেন। যেখানে যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে আমার মনে হলো তা আমি করলাম, এবং মিঃ গিলম্যান সেগুলি যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন। এইখানে আমি বলে রাখতে চাই যে, পরবর্তী আর কোন পরীক্ষায় আমাকে এই সুবিধাটুকু দেওয়া হয়নি। র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে উত্তর লেখা শেষ হয়ে যাবার পর কেউ সেগুলি আর একবার আমাকে পড়ে দেয় না। কাজেই নির্ধারিত সময় শেষ হবার পূর্বে যদি আমি লেখা শেষ করতে না পারি, তাহলে আমি আর আমার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করতে পারি না লেখার শেষে হাতে কিছু সময় থাকলেও, সেই দু'চার মিনিটের মধ্যে যে ক'টি ভুলের কথা আমার মনে পড়ে মাত্র সেই ক'টি সংশোধন করে খাতার শেষে তাদের উল্লেখ করে দিতে পারি। শেষ পরীক্ষার চেয়ে প্রাথমিক পরীক্ষায় আমি বেশী নম্বর পেয়ে পাশ করেছিলাম। এর দুটি কারণ আছে। শেষ পরীক্ষায় কেউ আমার লেখা উত্তরগুলি আমাকে আর একবার পড়ে দেয়নি। তা ছাড়া, প্রাথমিক পরীক্ষায় আমি যে সব বিষয় লিখেছিলাম, কেমব্রিজ বিদ্যালয়ে পড়া-শোনা আরম্ভ করবার আগেই তাদের কয়েকটির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। কারণ বৎসরের প্রথম দিকে মিঃ গিলম্যান হার্ভার্ডের পূর্ব পূর্ব বৎসরের প্রশ্নপত্র অবলম্বন করে ইংরাজি, ইতিহাস, ফরাসী ও জার্মান এই ক'টি বিষয়ে আমাকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং আমি সে পরীক্ষায় পাশও করেছিলাম।

আমার উত্তরের খাতাগুলি মিঃ গিলম্যান পরীক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে

দিলেন, এবং সেই সঙ্গে একখানি প্রমাণপত্রে লিখে দিলেন যে, আমি ২৩৩ নম্বরের পরীক্ষার্থী, এই খাতাগুলি লিখেছি।

অন্যান্য প্রাথমিক পরীক্ষাও এই একই ভাবে পরিচালিত হয়েছিল। অন্য কোন পরীক্ষাই প্রথম পরীক্ষার মত এত শক্ত হয়নি। আমার মনে আছে, যেদিন আমাদের ল্যাটিন প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় সেদিন অধ্যাপক শিলিং ভিতরে এসে আমাকে খবর দিয়ে গেলেন যে জার্মান পরীক্ষায় আমি সন্তোষজনক ভাবে পাশ করেছি। এর ফলে আমি খুব উৎসাহিত বোধ করলাম এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে ও অকম্পিত হস্তে সত্বর এই পরীক্ষাসমুদ্র পার হয়ে গেলাম।

উনিশ

মিঃ গিলম্যানের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের দ্বিতীয় বৎসর যখন শুরু হলো তখন আমার হৃদয় আশা ও সাফল্যের সংকল্পে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি নানা অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হলাম। এই বৎসর প্রধানতঃ আমি গণিত অধ্যয়ন করবো—এই প্রস্তাবে মিঃ গিলম্যান সম্মতি দিয়েছিলেন। আমি পদার্থবিদ্যা, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, গ্রীক ও ল্যাটিন—এই কয়টি বিষয় নিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ক্লাশের প্রারম্ভে আমার অনেকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তক যথাসময়ে উঁচু অক্ষরে ছাপা হয়ে ওঠে নি। কতকগুলি পাঠ্যবিষয়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আমি পাই নি। যে ক্লাসগুলিতে আমি পড়তাম সেগুলি মস্ত বড় বড় ছিল। সুতরাং শিক্ষকদের পক্ষে আমাকে কোনরূপ বিশেষ সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে মিস্ সালিভানকে আমার জন্য সমস্ত বই পড়ে দিতে হতো, সমস্ত শিক্ষকদের বক্তব্য আঙুলের

ভাষায় অনুবাদ করে দিতে হতো। এগার বৎসরের মধ্যে এই প্রথম আমার মনে হলো, তাঁর সেই প্রিয় হাতখানি আর বোধ হয় পেরে উঠবে না।

ক্লাসে বসে আমাকে বীজগণিত ও জ্যামিতির অঙ্ক কষতে হতো, পদার্থবিদ্যার নানা সমস্যার সমাধান লিখতে হতো। একটা ব্রেইল লিখন-যন্ত্র না কেনা পর্যন্ত আমি এর কিছুই করতে পারতাম না। এই যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কের প্রক্রিয়াগুলি ধাপে ধাপে সাজিয়ে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আঁকা জ্যামিতির চিত্রগুলি আমি চোখ দিয়ে দেখতে পেতাম না। এগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে আমার একমাত্র উপায় ছিল, বাঁকা ও ছুঁচালো অগ্রভাগবিশিষ্ট কতকগুলি সোজা ও বক্র তারের সাহায্যে ছোট একটি গদির উপর চিত্রগুলিকে রচনা করা। চিত্রগুলির নামাক্ষরসমূহ, প্রকল্প ও সিদ্ধান্ত, অঙ্কন ও প্রমাণ-প্রক্রিয়া—সবই আমাকে মনে করে রাখতে হতো। মিঃ কিথ তাঁর লিখিত বিবরণীতে এ সমস্ত কথার উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেল, প্রত্যেক বিষয় অধ্যয়নের পথেই তার নিজস্ব সব বাধা ছিল। কখনও কখনও আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলতাম এবং এমনভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতাম যে, তা মনে করতেও আজ লজ্জা হয়। বিশেষ লজ্জার কথা হলো এই যে, আমার এই সব চিত্তচাঞ্চল্যের চিহ্নগুলিকে পরে যুক্তি-হিসাবে মিস্ সালিভানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অথচ আমার সমস্ত সহৃদয় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেখানে উপস্থিত ছিলেন; একমাত্র তিনিই আমার জন্য বাঁকাকে সোজা করে দিতে পারতেন, বন্ধুর পথকে মসৃণ করে দিতে পারতেন।

কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত হতে লাগলো। উঁচু অক্ষরে ছাপানো বইগুলি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি এসে পৌঁছে গেল। পুনরুজ্জীবিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমি কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলাম।

বীজগণিত ও জ্যামিতি—একমাত্র এই দু'টি বিষয় বুঝবার চেষ্টায় আমি বারবার ব্যর্থমনোরথ হতে লাগলাম। পূর্বেই বলেছি, অঙ্কে আমার বিশেষ মাথা ছিল না। বিষয়টির বিভিন্ন খুঁটিনাটি যত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলে আমার পক্ষে ভালো হতো তা কখনও দেওয়া হয় নি। বিশেষ করে জ্যামিতির চিত্রগুলি আমার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হতো, কারণ এদের বিভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক কি, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না,—এমন কি গদীর উপর চিত্রগুলি গড়ে নিয়েও পারতাম না। মিঃ কিথের কাছে শিক্ষালাভের আগে অঙ্ক সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই আমার হয় নি।

এই সব বাধাবিঘ্ন সবে আমি অতিক্রম করতে আরম্ভ করেছি এমন সময় একটা ঘটনার ফলে সব ওলট পালট হয়ে গেল।

আমার বইগুলি এসে পৌঁছুবার ঠিক আগে মিঃ গিলম্যান মিস্ সালিভানের কাছে এই বলে আপত্তি তুলতে শুরু করলেন যে, আমি সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করছি। আমার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি আমার ক্লাসের সংখ্যা কমিয়ে দিলেন। প্রথমে অবশ্য রাজি হয়েছিলাম যে, যদি প্রয়োজন হয়, কলেজে ভর্তি হবার জন্য প্রস্তুত হতে আমি পাঁচ বৎসর সময় ব্যয় করবো; কিন্তু প্রথম বৎসরের শেষে পরীক্ষায় আমার সাফল্য দেখে মিস্ সালিভান, মিস্ হারবাফ্ (মিঃ গিলম্যানের প্রধান শিক্ষয়িত্রী) ও আর একজন অভিমত দিলেন যে, খুব বেশী পরিশ্রম না করেও আর দুই বছরে আমি আমার প্রস্তুতির পালা শেষ করতে পারবো। মিঃ গিলম্যান প্রথমে এদের মতে মত দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন আমার পড়াশুনোর কাজ একটু জটিল হয়ে উঠলো, তখন তিনি বারবার বলতে লাগলেন, আমি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছি, এবং আমার আরও তিন বছর তাঁর বিদ্যালয়ে থাকা প্রয়োজন। এ প্রস্তাব আমার মোটেই পছন্দ হয় নি, কারণ আমার

ইচ্ছা ছিল, আমার ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে একই সময়ে আমি কলেজে ভর্তি হবো।

সতেরই নভেম্বর তারিখে অসুস্থতার জন্য স্কুলে গেলাম না। মিস্ সালিভান অবশ্য জানতেন, আমার অসুস্থতা তেমন গুরুতর কিছু নয়; কিন্তু তথাপি মিঃ গিলম্যান এই খবর পেয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে। তখুনি তিনি আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা এমন ভাবে বদলে দিলেন যে, তার ফলে আমার ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে একত্রে শেষ পরীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। অবশেষে মিঃ গিলম্যান ও মিস্ সালিভানের মধ্যে মতভেদের ফলে আমার মা আমাকে ও আমার বোন মিল্ড্রেডকে কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

কিছুদিন কেটে যাবার পর স্থির হলো যে, কেম্ব্রিজের অধিবাসী মিঃ মার্টন এস. কিথ নামক একজন গৃহ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আমি লেখাপড়া চালিয়ে যাব। শীতকালের অবশিষ্টাংশ মিস্ সালিভান ও আমি আমাদের বন্ধু-পরিবার চেম্বারলিনদের বাড়ীতে কাটিয়ে দিলাম। এঁরা থাকতেন বস্টন থেকে পঁচিশ মাইল দূরে রেস্থাম নামক স্থানে।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে দুইদিন মিঃ কিথ রেন্থামে এসে আমাকে বীজগণিত, জ্যামিতি, গ্রীক ও ল্যাটিন পড়িয়ে যেতেন। মিস্ সালিভান তাঁর পড়ানো আমাকে বুঝিয়ে দিতেন।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমরা বস্টনে ফিরে এলাম। এর পর মিঃ কিথ আমাকে পড়িয়েছিলেন আট মাস,—প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক করে, সপ্তাহে পাঁচ দিন। প্রত্যেক দিন তিনি পূর্বদিনের পড়ার যে যে অংশ আমি বুঝতে পারিনি সেগুলি আবার বুঝিয়ে দিতেন, নূতন কাজ করতে

দিতেন, সমস্ত সপ্তাহ ধরে টাইপরাইটারের সাহায্যে আমি যে সব গ্রীক রচনা লিখতাম সেগুলি সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতেন, এবং পরে সেগুলির সম্পূর্ণ অশুদ্ধি-শোধন করে আমাকে ফিরিয়ে দিতেন।

এই ভাবে আমার কলেজে ভর্তি হবার প্রস্তুতি কার্য নির্বিঘ্নে চলতে লাগলো। ক্লাসে বসে শিক্ষালাভ করার চেয়ে নিজের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করা আমার কাছে অনেক বেশী সহজ ও প্রীতিকর বলে মনে হতে লাগলো। কোন তাড়াহুড়া নেই, হৈ-হাঙ্গামা নেই। আমি যা বুঝতে পারতাম না তা বুঝিয়ে দেবার জন্য আমার শিক্ষকের হাতে পর্যাপ্ত সময় থাকতো; সুতরাং বিদ্যালয়ের চেয়ে আমি অনেক দ্রুত কাজে এগিয়ে যেতে পারতাম, কাজও বেশী ভালো করতে পারতাম। অন্যান্য পাঠ্যবিষয় অধিগত করার চেয়ে গণিতের সমস্যা সমাধান করা এখনও আমার কাছে অনেক বেশী কঠিন ঠেকতো। হায়, ভাষা ও সাহিত্য যত সোজা, বীজগণিত ও জ্যামিতি যদি তার অর্ধেক সোজাও হতো! কিন্তু মিঃ কিথ অঙ্কশাস্ত্রকেও চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারতেন; সমস্যাগুলোকে টুকরো টুকরো করে তিনি এমন ছোট করে ফেলতেন যে, সেগুলো সহজেই আমার মগজে ঢুকতে পারতো। তিনি আমার মনকে সদাজাগ্রত ও আগ্রহশীল করে রাখতেন। উন্মাদের মত শূন্যে লাফ দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোর পরিবর্তে কি করে সুশৃঙ্খল যুক্তিপরম্পরার অবতারণা করতে হয়, কি করে ধীর-সুস্থে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়, আমার মনকে তা তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যতই নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করি না কেন, তিনি সর্বদাই তাঁর কোমলতা ও ক্ষমাশীলতা বজায় রাখতেন। বিশ্বাস করুন, আমার অনমনীয় নির্বুদ্ধিতায় বাইবেল-বর্ণিত জোব-এরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ও ৩০শে জুন তারিখে আমি র‍্যাডক্লিফ কলেজে ভর্তি হবার শেষ পরীক্ষা দিই। প্রথম দিন প্রাথমিক গ্রীক ও

উচ্চতর ল্যাটিনের পরীক্ষা দিই ; দ্বিতীয় দিন দিই জ্যামিতি, বীজগণিত ও উচ্চতর গ্রীকের।

কলেজের কর্তৃপক্ষ এবার মিস্ সালিভানকে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি আমার কাছে পড়ে দেবার অনুমতি দিলেন না। সুতরাং প্রশ্নপত্রগুলি আমেরিকান ব্রেইল পদ্ধতিতে নকল করে দেবার জন্য মিঃ ইউজিন সি. ভাইনিং নামক পার্কিন্‌স্ অন্ধ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষককে নিযুক্ত করা হলো। মিঃ ভাইনিং আমার অপরিচিত ব্যক্তি। একমাত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে লিখে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তিনি আমাকে তাঁর মনের ভাব জানাতে পারতেন না। যিনি প্রক্টর ছিলেন তিনিও আমার অপরিচিত। আমার সঙ্গে কোন উপায়ে ভাবের আদান-প্রদান করার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি।

ভাষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রেইল পদ্ধতিতে বেশ কাজ চালানো যেত; কিন্তু জ্যামিতি ও বীজগণিতের বেলায় নানা অসুবিধার উদ্ভব হতো। মাঝে মাঝে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তাম ; বিশেষ করে বীজগণিতের বেলায় মূল্যবান সময়ের অযথা অপব্যয়ের ফলে নিরুদ্যম হয়ে পড়তাম। একথা অবশ্য সত্য যে, আমাদের দেশে যত প্রকার সাহিত্যিক ব্রেইল পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সবগুলির সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল ; ইংরাজি পদ্ধতি, আমেরিকান পদ্ধতি, নিউ ইয়র্ক পয়েন্ট পদ্ধতি—সবই আমি জানতাম। কিন্তু এই তিন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত জ্যামিতি ও বীজগণিতের বিভিন্ন সংকেতগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ ধরণের। বীজগণিত শিখবার সময় আমি শুধু ইংরাজি ব্রেইল পদ্ধতির ব্যবহার শিখেছিলাম।

পরীক্ষার দুই দিন আগে মিঃ ভাইনিং হার্ভার্ডের একখানি পুরাতন বীজগণিতের প্রশ্নপত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে নকল করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যখন দেখতে পেলাম যে, এতে তিনি আমেরিকান ব্রেইল পদ্ধতির

সংকেতাদি ব্যবহার করেছেন, তখন আমি আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। তখুনি বসে মিঃ ভাইনিংকে একখানি চিঠি লিখলাম, অনুরোধ করলাম তিনি যেন সংকেতগুলি আমাকে বুঝিয়ে দেন। ফেরৎ ডাকে আমি আর একখানি প্রশ্নপত্র পেলাম; সঙ্গে পেলাম সংকেতগুলির একটি তালিকা। তখুনি এই সংকেতলিপিগুলি শিখে নেবার চেষ্টা আরম্ভ করলাম। কিন্তু বীজগণিত পরীক্ষার আগের দিন রাত্রে যখন আমি কয়েকটি অতি জটিল অঙ্ক নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি, তখন দেখতে পেলাম, লঘুবন্ধনী ধনুর্বন্ধনী ও মূলচিহ্ন একত্র ব্যবহৃত হলে আমি আর কিছুই পারছি না। মিঃ কিথ ও আমি দুজনেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম; কাল কি হবে ভেবে মন আশঙ্কায় ভরে উঠলো। কিন্তু আমরা পরীক্ষা আরম্ভ হবার একটু আগে কলেজে গিয়ে পৌঁছুলাম এবং মিঃ ভাইনিংকে দিয়ে আমেরিকান পদ্ধতির সংকেতগুলি আরও বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে নিলাম।

জ্যামিতি পরীক্ষার আমার প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, পূর্বে আমি বরাবরই প্রতিজ্ঞাগুলি পংক্তি লিপিতে পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম, কিংবা সেগুলিকে নিজের হাতে বানান করিয়ে নিয়ে পড়তাম; সুতরাং এখন যদিও প্রতিজ্ঞাগুলি আমার সামনেই ছিল, তথাপি ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহারের ফলে সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল; আমি কি পড়ছি তা স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু বীজগণিতের প্রশ্ন নিয়ে আমি আরও বেশী বিপদে পড়ে গেলাম। যে সংকেতগুলি আমি সম্প্রতি শিখেছিলাম, ভেবেছিলাম সেগুলি আমার বেশ আয়ত্ত হয়েছে। কাজের সময় কিন্তু আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। তা ছাড়া টাইপরাইটারে আমি কি লিখছি তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। বীজগণিতের অঙ্ক আমি বরাবর হয় ব্রেইল লিপিতে আর না হয় মনে মনেই করেছি। আমার মনে মনে অঙ্ক কষার ক্ষমতার উপর মিঃ কিথ বড় বেশী নির্ভর করতেন; পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর কি করে লিখতে

হয় সে শিক্ষা তিনি আমাকে দেন নি। ফলে, আমি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কাজ করতে পারছিলাম। প্রশ্নের অঙ্কগুলি বারংবার পড়ে তবে আমি বুঝতে পারছিলাম, আমায় কি করতে হবে। সত্য কথা বলতে কি, সমস্ত সংকেতগুলি যে আমি ঠিক ঠিক পড়তে পেরেছিলাম সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ নই। মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু কারও বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। র‍্যাডক্লিফ কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতি বুঝতে পারেন নি, আমার পক্ষে পরীক্ষাটা তাঁরা কত শক্ত করে তুলছেন। আর আমাকে যে সব বিচিত্র বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়েছিল সে সম্বন্ধেও তাঁদের কোন জ্ঞান ছিল না। হয়তো না ভেবে চিন্তেই তাঁরা আমার পথে নানা প্রতিবন্ধক স্থাপন করেছিলেন। আমার সান্ত্বনা হচ্ছে এই যে, আমি তাদের সবগুলিকেই অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কুড়ি

কলেজে ঢুকবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টার অবসান হলো। এখন আমি যখন খুসি র‍্যাডক্লিফ কলেজে ভর্তি হতে পারি। কিন্তু ভর্তি হবার আগে মিঃ কিথের কাছে আর এক বছর পড়াই আমার পক্ষে শ্রেয় বলে বিবেচিত হলো। সুতরাং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের হেমন্তকালের পূর্বে আমার কলেজে পড়ার স্বপ্ন সফল হতে পারলো না।

র‍্যাডক্লিফ কলেজে আমার প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ে। দিনটি আমার পক্ষে নানা ঔৎসুক্য ও আগ্রহে ভরা ছিল। বছরের পর বছর ধরে

আমি এই দিনটির প্রতীক্ষা করেছি। মনের ভিতর থেকে একটা প্রবল শক্তি প্রেরণা দিয়েছে,—যারা দেখতে পায়, শুনতে পায় তাদের নিরিখে নিজের ক্ষমতা যাচাই করে নিতে হবে। বন্ধুবান্ধবের চেয়ে, এমন কি নিজের হৃদয়ের যুক্তিতর্কের চেয়েও, এই প্রেরণা বেশী শক্তিশালী ছিল। জানতাম, পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে, কিন্তু তাদের অতিক্রম করার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম। একজন জ্ঞানী রোমান একবার বলেছিলেন, "রোম থেকে নির্বাসিত হওয়ার অর্থ রোমের বাইরে গিয়ে বাস করা,—তার বেশী কিছু নয়।" জ্ঞানার্জনের সুপ্রশস্ত সদর রাস্তা আমার পক্ষে বন্ধ ; সুতরাং আমাকে অজানা অচেনা পথ ধরে ধরে জ্ঞানরাজ্য ভ্রমণ করতে হবে,—এই মাত্র। আমি জানতাম, কলেজ-জীবনে বিস্তর অলিগলি আছে। সেখানে আমি এমন অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসতে পারবো যারা আমারই মত চিন্তা করে, আমারই মত ভালোবাসে. আমারই মত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করে।

খুব আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া আরম্ভ করলাম। মনে হলো যেন, আমার সামনে আলোক ও সৌন্দর্যে ভরা এক নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। মনে হলো, সব জিনিস জানবার, সব জিনিস শিখবার ক্ষমতা আমার আছে। মনোরাজ্যের কল্পলোকে আর সবাই-এর মত আমিও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবো। সেখানকার জনগণ, দৃশ্যাবলী, আচার-ব্যবহার, আনন্দ-বিষাদ আমার কাছে জীবন্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠবে ; এই বাস্তব জগতের অর্থ-তাৎপর্য তারাই আমাকে বুঝিয়ে দেবে। মনে হলো, বক্তৃতা কক্ষগুলি যেন অতীতের জ্ঞানী-গুণীদের আত্মার প্রভাবে পরিপূর্ণ ; অধ্যাপকেরা যেন মনীষার অবতার স্বরূপ। পরে হয়তো আমার অন্য রকম শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু সেকথা আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না।

কিন্তু শীঘ্রই আমি দেখতে পেলাম, কলেজকে আমি যে পরমাশ্চর্য বিদ্যামন্দিররূপে কল্পনা করেছিলাম, স্থানটি ঠিক তা নয়। আমার কৈশোর

কল্পনা যে আনন্দময় স্বপ্নালোকে ভরপুর হয়ে উঠেছিল; ক্রমে তার রঙ ফিকে হয়ে আসতে লাগলো, ক্রমে তা "ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে সাধারণ দিনের সাধারণ আলোকে পরিণত হলো।" ক্রমে ক্রমে আমি বুঝতে পারলাম যে, কলেজে পড়ারও নানা অসুবিধা আছে।

তখন যেটা সব চেয়ে বড় অসুবিধা বলে মনে হয়েছিল, এবং এখনও হয়, সেটি হচ্ছে সময়াভাব। এর আগে আমি আর আমার মন—দু'জনে একান্তে বসে চিন্তা করবার অবকাশ পেতাম। অনেক সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে একত্রে বসে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ থেকে উৎসারিত সুরলহরী শ্রবণ করেছি। অবকাশ মুহূর্তে যখন কোন প্রিয় কবির কাব্যবাণী মনের এক গহন-মধুর তন্ত্রীতে আঘাত করে,—নীরব মনোবীণা সরব হয়ে ওঠে, এই সুর শুধু তখনই শোনা যায়। কলেজে কিন্তু চিন্তা-বিলাসের সময় জোটে না। রকম সকম দেখে মনে হয়, কলেজে বুঝি শুধু শিক্ষাই করতে হয়, চিন্তা এখানে নিষিদ্ধ। নির্জনতা বল, পুঁথিপত্র বল, কল্পনাবিলাস বল—মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ আনন্দ, বিদ্যায়তনের দ্বারপথে প্রবেশের সময় সবই ফেলে আসতে হয় বাইরের ঐ সর্মর মর্মরিত পাইন গাছগুলির পাশে। যে সব ঐশ্বর্য এখন আহরণ করছি ভবিষ্যতে তা উপভোগ করতে পারবো, এই ভেবে হয়তো আমার সান্ত্বনা পাওয়া উচিত। কিন্তু আমি অপরিণামদর্শী মানুষ —ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার চেয়ে বর্তমানের আনন্দকেই বেশী পছন্দ করি।

কলেজে প্রথম বৎসর আমার পাঠ্যবিষয় ছিল ফরাসী ভাষা, জার্মাণ ভাষা, ইতিহাস, ইংরাজি রচনা ও ইংরাজি সাহিত্য। ফরাসী ভাষার পাঠ্য হিসাবে আমাকে পড়তে হয়েছিল কর্নেই, মলিয়ারে, রাসিন, আলফ্রেড দ্য মুসে ও সাঁ্যাৎ-ব্যুভ-এর কোন কোন গ্রন্থ; জার্মাণ ভাষার পাঠ্য হিসাবে পড়তে হয়েছিল গ্যেটে ও শিলার-এর গ্রন্থাবলী। রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে

আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র ঐতিহাসিক যুগটির খুঁতে পর্যালোচনা আমাকে করতে হয়েছিল ; আর ইংরাজি সাহিত্যে মিলটনের কাব্যগ্রন্থাবলী ও তাঁর Areopagitica সম্বন্ধে সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে পড়তে হয়েছিল।

কলেজে আমাকে যে অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হয় তার বাধা-বিঘ্ন আমি কি করে অতিক্রম করি,—এ প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেছেন। ক্লাসের মধ্যে আমি এক রকম একাই থাকি। অধ্যাপক অনেক দূরে আছেন বলে মনে হয়, যেন টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কথা বলছেন। যত দ্রুত সম্ভব বক্তৃতাগুলি আমার হাতে বানান করে দেওয়া হয়। অধ্যাপক ও আমার মধ্যে যেন একটা দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই প্রতি-যোগিতায় এগিয়ে যাবার ঝোঁকে পড়ে বক্তার বৈশিষ্ট্যের অনেকখানিই আমি ধরতে পারি না। আমার হাতের ভিতর দিয়ে কথার পর কথা ছুটতে থাকে, যেন একটা খরগোসের পিছনে একপাল কুকুর দৌড়াচ্ছে। খরগোস অধিকাংশ সময়ই ধরা পড়ে না। কিন্তু আমার মনে হয়, যে সব মেয়েরা ক্লাসে নোট টুকে নেয়, এই ব্যাপারে আমার অবস্থা তাদের চেয়ে বেশী খারাপ নয়। মন যদি কথা শোনামাত্র বিদ্যুৎগতিতে তা কাগজে টুকে নেবার যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে কেউ আলোচ্য বিষয়ের প্রতি কিংবা যে ভাবে সেটি উপস্থাপিত করা হচ্ছে তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে বলে আমার মনে হয় না। বক্তৃতার সময় আমি নোট নিতে পারি না, কারণ আমার হাত কথা শোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ ঘরে ফেরার পর যতটা মনে পড়ে তাই আমি লিখে রাখি। প্রশ্নের উত্তর, দৈনিক রচনা, সমালোচনা, ক্লাসের মধ্যে আকস্মিক পরীক্ষা, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা—সব আমি আমার টাইপরাইটারের সাহায্যে লিখে থাকি। সুতরাং আমি যে কত কম জানি তা বুঝতে আমার অধ্যাপকদের একটুও অসুবিধা হয় না। যখন আমি

প্রথম ল্যাটিন ছন্দোবিজ্ঞান পড়তে শুরু করি, তখন বিভিন্ন ছন্দ ও গুরুলঘু মাত্রা বোঝাবার জন্য নিজেই একটি সংকেতমালা উদ্ভাবন করে তা আমার অধ্যাপককে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি হ্যামণ্ড টাইপরাইটার ব্যবহার করে থাকি। বহু প্রকার যন্ত্র পরীক্ষা করে আমি দেখেছি যে, এই হ্যামণ্ড টাইপরাইটারটি আমি যে ধরণের কাজ করি তার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এই যন্ত্রের সঙ্গে যে হরফ-দানি ব্যবহার করা হয় তা ইচ্ছামত বদলানো যায় কাজেই টাইপরাইটারে যে যে ধরণের কাজ করবার ইচ্ছা থাকে, তদনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হরফ-দানি ব্যবহার করা চলে,—কোনটিতে থাকবে গ্রীক হরফ, কোনটিতে থাকবে ফরাসী হরফ, কোনটিতে বা থাকবে অংকশাস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় হরফ। এই যন্ত্রটি না হলে আমার পক্ষে কলেজে পড়া সম্ভব হতো কি না সন্দেহ।

বিভিন্ন পাঠ্যসূচীর জন্য প্রয়োজন বইগুলির খুব অল্পই অন্ধদের জন্য মুদ্রিত হয়েছে। কাজেই অধিকাংশ বই পড়বার সময় আমার হাতের বানান করিয়ে নিতে হয়। এর ফলে পড়া তৈরি করতে অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে আমার বেশী সময় লাগে। হাতের কাজে অনেক বেশী সময় লেগে যায়। তাছাড়া আমাকে এমন অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় যা অন্য মেয়েদের হয় না। খুঁটিনাটির প্রতি আমাকে বড় বেশী মনোযোগ দিতে হয়। এই জন্য অনেক সময় আমার মন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। বাইরের জগতে যখন অন্য মেয়েরা হেসে গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে আমাকে তখন সামান্য ক'টি পরিচ্ছেদ পড়বার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরিশ্রম করতে হচ্ছে,—এই চিন্তা আমার মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু স্বাভাবিক স্ফূর্তি ফিরে পেতে আমার বেশী সময় লাগে না; মন থেকে অসন্তোষের মেঘ আমি শীঘ্রই হাসির হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারি। কারণ, সংস্কার জ্ঞান যারা অর্জন করতে চায় তাদের প্রত্যেককেই দুর্লঙ্ঘ্য

বাধার পাহাড় একাকী অতিক্রম করতে হবে। এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠবার কোন সোজা রাজপথ নেই; কাজেই আমাকে আমার নিজের আঁকাবাঁকা পথ বেয়েই উপরে উঠতে হবে। বহুবার আমি পিছিয়ে পড়ি, আছাড় খাই, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, গোপন প্রতিবন্ধের সামনে এসে পড়ি। বহুবার ধৈর্য চ্যুতি ঘটে, আবার ধৈর্য ধারণ করি, ভবিষ্যতে ধৈর্য রক্ষা করতে শিখি। আবার চলতে থাকি; হয়তো একটু অগ্রসর হই, তার ফলে উৎসাহ বাড়ে, নূতন আগ্রহ নিয়ে আরোহণ করতে থাকি; চোখের সামনে দিগন্ত প্রসারিত হয়ে উঠতে থাকে। প্রত্যেকটি চেষ্টাই একটা নূতন বিজয়লাভ। আর একবার যদি প্রাণপণ চেষ্টা করতে পারি, তাহলেই ঐ সমুজ্জ্বল মেঘমালার মধ্যে, আকাশের ঐ সুনীল গভীরতার মধ্যে, আমার অভিলষিত উর্ধ্বলোকে গিয়ে পৌঁছুতে পারবো। এই সব প্রচেষ্টায় আমি যে সব সময়েই সঙ্গীহীন তা নয়। মিঃ উইলিয়ম ওয়েড এবং পেনসিলভানিয়া অন্ধ শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ ই. ই. অ্যালেন আমার প্রয়োজনীয় অনেক বই উঁচু হরফে ছাপিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। আমার প্রতি তাঁদের এই যত্ন ও মনোযোগ আমাকে যে কত সাহায্য করেছে, কত উৎসাহ দিয়েছে তা তাঁরা কোনদিনই জানতে পারবেন না।

আমার র‍্যাডক্লিফ কলেজে অধ্যয়নের দ্বিতীয় বৎসরে, আমার পাঠ্য বিষয় ছিল ইংরাজি রচনা, ইংরাজি সাহিত্য হিসাবে বাইবেল, আমেরিকা ও ইউরোপের শাসনতন্ত্র, হোরেসের Odes এবং ল্যাটিন প্রহসন বা মিলনাত্মক নাটক। রচনার ক্লাসটি ছিল সবচেয়ে প্রীতিকর ও অতিমাত্রায় প্রাণচঞ্চল। বক্তৃতাগুলি সর্বদাই চিত্তাকর্ষক, সজীব ও সরস হতো। কারণ এই ক্লাসের শিক্ষক মিঃ চার্লস্ টাউনসেণ্ড কোপল্যাণ্ড সাহিত্যের মৌলিক নবীনত্ব ও প্রাণশক্তিকে তোমার চোখের উপর মূর্ত করে তুলতে পারতেন। এই বৎসরের পূর্বে আমি এমন শিক্ষক কখনও পাই নি। সংক্ষিপ্ত এক ঘণ্টা-

কালের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যগুরুদের শাশ্বত সৌন্দর্যের উৎস থেকে তুমি প্রাণভরে পান করে নিতে পারতে; তাঁদের মহচ্চিন্তার রসে নিজেকে অভিষিক্ত করে নিতে পারতে। অপ্রয়োজনীয় টীকাভাষ্য তোমার পথে কোন বাধা জন্মাতো না। জিহোভা ও ইলোহিমের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তুমি ওল্ড্ টেস্টামেন্টের সুমধুর মেঘগর্জনের সঙ্গীত উপভোগ করতে পারতে। তারপর, "যে পরিপূর্ণতার মধ্যে ভাব ও ভাষা একত্র মিলে এক অমর ছন্দের সৃষ্টি করে, কালের সুপ্রাচীন বৃক্ষকাণ্ডে সত্য ও সুন্দরের স্পর্শ যে নূতন পুষ্প-পল্লব জাগিয়ে তোলে"—তার আভাস তুমি পেয়েছ, এই অনুভূতি নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পারতে।

কলেজের বর্তমান বৎসরটি আমার কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর, কারণ যে সব পাঠ্যবিষয় এখন আমি পড়ছি সেগুলি আমার কাছে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। এখন আমি পড়ছি অর্থনীতি, এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য, অধ্যাপক জর্জ এল. কিট্রিজের কাছে শেক্সপীয়র এবং অধ্যাপক জোসিয়া রয়েসের কাছে দর্শনের ইতিহাস। সুদূর অতীতের যে সব রীতি নীতি এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত যে সব অপরিচিত চিন্তাধারা প্রথমে অবাঞ্ছিত ও অযৌক্তিক বলে মনে হয়, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করলে সেগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করবার ক্ষমতা জন্মে।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীর ন্যায় কলেজ বুঝি বিশ্ববিদ্যার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু পরে দেখলাম তা নয়। এখানকার পথে ঘাটে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীজনের সাক্ষাৎ মেলে না, তাঁদের সঞ্জীবন স্পর্শও এখানে খুব সুলভ নয়। তাঁরা এখানে আছেন বটে, কিন্তু মনে হয় যেন 'মামি' হয়ে আছেন। পুঞ্জীভূত বিদ্যার প্রস্তর প্রাচীর ভেঙে তাঁদের উদ্ধার করতে হয়। তারপর কেটে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়। তবেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি, সুনিপুণ হাতে গড়া কোন নকল

মিল্টন বা নকল আইজায়া নয়, আসল মানুষগুলিকেই আমরা পেয়েছি। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রসোপভোগ প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের সংবেদনের গভীরতার উপর,—বুদ্ধিবৃত্তির উপর নয়। অনেক পণ্ডিতেরা এই কথাটাই ভুলে যান বলে মনে হয়। আসল বিপদটা হলো এই যে, তাঁদের কষ্টকল্পিত টীকাভাষ্যের অধিকাংশই বেশীক্ষণ আমাদের মনে থাকে না। ডাল থেকে খসে পড়া অতি পক্ক ফলের মত এগুলিও আমাদের মন থেকে অতি সহজে ঝরে পড়ে যায়। একটি ফুলকে দেখলাম,—তার শিকড়ের খবর, তার শাখা-কাণ্ডের খবর, কি করে সে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠলো তার খবর, সব তন্ন তন্ন করে জেনে নিলাম; অথচ আকাশ থেকে ঝরে পড়া শিশিরে ধোয়া ফুলটির সৌন্দর্যের কোন উপলব্ধিই হলো না;—এও তো সম্ভব! বার বার অধীর ভাবে আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি, "এই সব টীকাটিপ্পনী, এই সব অনুমান কল্পনা,—এ নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন?" নিষ্ফল পক্ষসঞ্চালনকারী দৃষ্টিহীন পাখির মত এরা আমার মনের মধ্যে ইতস্ততঃ উড়ে বেড়ায়, কোথাও স্থির হয়ে বসে না। কোনও বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠের সময় ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে যা কিছু জানা সম্ভব সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেওয়ায় যে আমার কোন আপত্তি আছে তা নয়। আমার আপত্তি শুধু অন্তহীন টীকাভাষ্যে, বিভ্রান্তিকর সমালোচনার বাহুল্যে। এ সব থেকে শুধু একটি মাত্র শিক্ষালাভ করাই সম্ভব,—"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।" কিন্তু যখন অধ্যাপক কিটরিজের মত মহাপণ্ডিত কবিগুরু শেকস্পীয়রের রচনা ব্যাখ্যা করে শোনান, তখন মনে হয় যেন অন্ধের নূতন দৃষ্টিশক্তি হলো। শেকস্পীয়রের কবিসত্তাকেই তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার অধীতব্য বিষয়ের অর্ধেক আমি ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলি। এত অমানুষিক পরিশ্রম করে যে সম্পদ,

আহরণ করা হয় ক্লান্ত মনের পক্ষে তা থেকে কোন আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, একই দিনে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ক চার পাঁচখানি ভিন্ন ভিন্ন বই পড়লে পড়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। সর্বদাই মনের মধ্যে রয়েছে, লিখে পরীক্ষা দিতে হবে—সেই কথা। সুতরাং শঙ্কাকুলচিত্তে যত দ্রুত সম্ভব শুধু পড়ে যাচ্ছি। এর ফলে কি হয়? এক গাদা বাছা বাছা তথ্যে মগজ বোঝাই হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি সত্যই কোন কাজে লাগে না। বর্ত্তমান মুহূর্তে আমার মন বিভিন্ন ধরণের নানা তথ্যে এমন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে যে, এগুলিকে যে কোনদিন সুশৃঙ্খল ভাবে গুছিয়ে ফেলতে পারবো সে আশা রাখি না। একদিন আমি আমার মনোরাজ্যের অধীশ্বরী ছিলাম। কিন্তু আজ যদি আমি সেখানে প্রবেশ করতে চাই, মনে হবে যেন প্রবাদের সেই ষাঁড়টি চীনামাটির বাসনের দোকানের মধ্যে ঢুকেছে। হাজারো রকমের সঞ্চিত বিদ্যার টুকরা শিলাবৃষ্টির মত মাথার উপর হুড়মুড় করে পড়তে থাকে। পালাতে গেলে পিছু ধাওয়া করে রচনা-লেখার ভূতের দল আর কলেজের আনাচ-কানাচ থেকে নানা ধরণের পিশাচের পাল। অবশেষে মনে হয়, যে সব প্রতিমা পূজার জন্য এখানে এসেছিলাম সেইগুলিকেই চুরমার করে ভেঙে ফেলি। এই গর্হিত চিন্তার জন্য ঈশ্বর আমাকে মার্জনা করুন!

কিন্তু আমার কলেজ-জীবনের সবচেয়ে বড় জুজুর ভয় হলো পরীক্ষার ভয়। বহুবার আমি এদের সম্মুখীন হয়েছি, বহুবার এদের পরাভূত করে ধরাশায়ী করেছি। তথাপি তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে আবার আমাকে ভয় দেখায়। আমিও যেন বব্ একার্সের মত সব সাহস হারিয়ে আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠি। এই অগ্নি-পরীক্ষাগুলির আগের দিন কটি শুধু অসংখ্য রহস্যময় সূত্র আর দুষ্পাচ্য তারিখের তালিকা গলাধঃকরণ করতেই কেটে যায়। এই সব অখাদ্য বস্তু

গিলতে গিলতে অবশেষে মনে হয়, যদি দুনিয়ার সব জ্ঞানবিজ্ঞান, সব বই আর আমি নিজে এক সঙ্গে সাগরের জলের নীচে তলিয়ে যেতাম তাহলেই বোধ হয় ভালো হতো।

অবশেষে সেই ভয়ানক মুহূর্তটি এসে পড়ে। তখন যদি তুমি নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করতে পারো, যে সব চিন্তা ও ভাব এই রকম প্রচেষ্টায় তোমাকে সাহায্য করতে পারবে সেগুলিকে যথাসময়ে সমরক্ষেত্রে আহ্বান করতে পারো, তাহলে তুমি সত্যই ভাগ্যবান। অধিকাংশ সময়েই কিন্তু তোমার তূর্যনিনাদের আহ্বানে কেউ সাড়া দেয় না। ঠিক যে সময়ে তোমার তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির ও সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন তখনই তারা পাখনা মেলে উড়ে পালিয়ে যায়। বড়ই বিভ্রান্তিকর ও বিরক্তিকর ব্যাপার! অপরিসীম যত্নসহকারে যে সব তথ্য তুমি তোমার মনের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তটিতে তাদের কারও দেখা মেলে না।

"হুস্ ও তাঁহার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।"—হুস্? তিনি আবার কে? কি কাজই বা তিনি করেছিলেন? নামটা যেন খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে! তুমি তোমার ইতিহাসজ্ঞানের ঝুলি খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করে দিলে,—যেন ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটুলি খুলে এক টুকরা রেশমী কাপড়ের সন্ধান করছো। তুমি ঠিক বুঝতে পারছো, মনের মধ্যে কোথাও—বোধ হয় উপরের দিকেই—নামটা আছে। এই সেদিন যখন ধর্মসংস্কারের গোড়ার কথা নিয়ে পর্যালোচনা করছিলে, তখন নামটা তুমি দেখেছিলে। কিন্তু এখন সেটা কোথায় গেল? ঝুলি হাতড়ে তুমি বহু প্রকারের টুকরা তথ্য টেনে বার করতে লাগলে,—কত বিপ্লব, কত ধর্মসংক্রান্ত মতভেদ, কত খুনোখুনি, কত রকমের শাসনতন্ত্র! কিন্তু হুস্? তিনি কোথায়? অবাক কাণ্ড! প্রশ্নপত্রে নেই এমন কত জিনিস

তুমি জান! অবশেষে অধৈর্য হয়ে তুমি তোমার পুঁজিপাটা সব উজাড় করে ঢেলে ফেললে। ঐ যে! এক কোণে তোমার লোকটি বসে আছেন। অতি প্রশান্তভাবে নিজের মনের নিভৃত চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন। আর এদিকে যে তোমাকে কি মহাদুর্দৈবের মধ্যে ফেলেছেন তার বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

ঠিক এই সময়ে প্রক্টর তোমাকে জানিয়ে দিলেন যে, আর সময় নেই। তোমার মন অপরিসীম বিতৃষ্ণায় ভরে উঠলো। অকেজো জঞ্জালের রাশি লাথি মেরে এক কোণে ঠেলে ফেলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলে। মগজের মধ্যে নানা বিপ্লব-চিন্তা গজিয়ে উঠছে। পরীক্ষার্থীদের সম্মতি না নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার যে দৈবী অধিকার অধ্যাপকদের আছে তার বিলোপ সাধন করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে, এই পরিচ্ছেদের পূর্ববর্তী দুই তিন পৃষ্ঠায় আমি যে সব অলঙ্কার ব্যবহার করেছি তার ফলে আমার হাস্যাস্পদ হবার আশঙ্কা আছে। হাঁ,—এই যে, আমার চারিদিকে তারা আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে, মুখ ভেঙচাচ্ছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষা সব যাচ্ছেতাই রকমে গুলিয়ে ফেলেছি। চীনামাটির বাসনের দোকানের মধ্যে ষাঁড়ের মাথায় শিলাবৃষ্টি হচ্ছে! জুজুর মুখ বিবর্ণ পাণ্ডুর,—সে আবার কি রকম জুজু! কিন্তু তা হোক। যে মানসিক আবহাওয়ায় আমি এখন বাস করি তার মধ্যে নানা চিন্তা, নানা ধারণা অনবরত বিশৃঙ্খল ভাবে হুড়োহুড়ি করে ঘুরে বেড়ায়। আমার কথাগুলির মধ্যে এই আবহাওয়ার রূপটি ঠিক ধরা পড়েছে। সুতরাং এবারের মত তাদের দোষত্রুটি আমি দেখেও দেখবো না। তার চেয়ে বরং গম্ভীর ভাবে বলে ফেলা যাক্, কলেজ সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেছে।

আমার র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজের জীবন যখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল, তখন তার চারদিকে আমি একটা কাল্পনিক সৌন্দর্যের আলোক মণ্ডল রচনা

করেছিলাম। আজ তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু কল্পনা থেকে বাস্তবে আসবার পথে আমি অনেক নূতন জিনিস শিখেছি। এই অভিজ্ঞতা যদি আমার না হতো তাহলে এসব কিছুই আমি শিখতে পারতাম না। যে সব জিনিস আমি নূতন জেনেছি তার মধ্যে একটা হলো ধৈর্যরক্ষার মূল্যবান কলাকৌশল। এ থেকে শিখেছি, পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ করার মত বিশ্রান্তির মনোভাব নিয়ে জ্ঞানার্জন করতে হয়। মনের দরজা খুলে রাখতে হয়, যেখান থেকে যে ছাপই এসে পড়ুক না কেন, সাদরে তাকে চিত্তপটে এঁকে নিতে হয়। এইভাবে অর্জিত জ্ঞান সকলের দৃষ্টির অন্তরালে হৃদয়ের অন্তস্তলকে সুগভীর চিন্তার নিঃশব্দ প্লাবনে প্লাবিত করে দেয় লোকে বলে, জ্ঞানই শক্তি। তার চেয়ে বলা ভালো, জ্ঞানই সুখ। কারণ, সত্যকার জ্ঞান লাভ করলে, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারলে, জীবনের কোন্ লক্ষ্যটি ভ্রান্ত কোন্ লক্ষ্যটি সত্য, কোন্ বস্তুটি হেয় কোন্ বস্তুটি মহান্, তা বুঝতে আর কোন কষ্ট হয় না। যে সব চিন্তা ও কর্ম মানবজাতির উন্নতির সোপানস্বরূপ হয়ে আছে, সেগুলিকে জানতে পারলে যুগযুগান্তব্যাপী মানবতার হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। এই স্পন্দন ধ্বনির মধ্যে যদি কেউ একটা ঈশ্বরাভিমুখী প্রচেষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে না পারে, তাহলে সে সত্যই বধির,—জীবন-সঙ্গীতের সুরমূর্ছনা সে কানে শুনতে পায় না।

একুশ

এ পর্যন্ত আমি আমার জীবনের ঘটনাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি; কিন্তু বই পড়ার উপর জীবনে আমি কতখানি নির্ভর করেছি তা এখনও বলিনি। আর সবাই বই পড়ে যে জ্ঞান ও আনন্দ আহরণ করে শুধু যে তারই জন্য আমি বই-এর উপর নির্ভর করেছি তা নয়, চক্ষু ও কর্ণের ভিতর দিয়ে যে জ্ঞান তাদের মনের মধ্যে এসে পৌঁছায় তার জন্য করেছি। বস্তুতঃ আর সকলের বেলায় যতটা হয়ে থাকে আমার শিক্ষার বেলায় বই থেকে আমি তার চেয়ে ঢের বেশী সাহায্য পেয়েছি। সুতরাং আমি যখন প্রথম বই পড়তে আরম্ভ করি সেই সময় থেকেই আমার কাহিনী শুরু করবো।

জীবনে প্রথম ধারাবাহিক গল্প আমি পড়ি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। তখন আমার বয়স সাত বছর। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত ছাপা কাগজ জাতীয় যা কিছু আমার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে আমার এই আঙুলের ডগা দিয়ে সব গোগ্রাসে গিলেছি। পূর্বেই বলেছি, আমার শিশুজীবনের গোড়ার দিকে আমি নিয়মিত পাঠাভ্যাস করতাম না। বই-পড়ারও আমার কোন আইন কানুন ছিল না।

প্রথমে উঁচু অক্ষরে ছাপা বই আমার কয়েকখানি মাত্র ছিল,—প্রথম পাঠার্থীদের জন্য কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক, একখানি ছেলেমেয়েদের গল্পসঙ্কলন ও "আমাদের জগৎ" নামক পৃথিবী সম্বন্ধীয় একখানা বই। এই বোধ হয় সব। কিন্তু বই ক'খানা আমি এতবার ফিরে ফিরে পড়েছিলাম যে, উঁচু অক্ষরে ছাপা কথাগুলি আঙুলের চাপে চাপে একেবারে সমান হয়ে

গিয়েছিল; আর প্রায় সেগুলিকে বুঝতেই পারতাম না। মাঝে মাঝে মিস্ সালিভান আমাকে পড়িয়ে দিতেন; যে সব ছোট ছোট গল্প ও কবিতা আমি বুঝতে পারবো বলে মনে করতেন সেগুলি আমার হাতে বানান করে দিতেন। কিন্তু পরে পড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে আমি নিজে পড়তে বেশী ভালোবাসতাম, কারণ পড়ে যা আমার ভাল লাগতো তা আমি বার বার পড়তে চাইতাম।

প্রথমবার বস্টন যাত্রার সময়েই আমি সত্য সত্য আগ্রহের সঙ্গে বই পড়তে আরম্ভ করি। প্রতিদিন কিছু সময় আমাকে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে কাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সময় আমি এক আলমারি থেকে আর এক আলমারির সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম, হাতে যে বই ঠেকতো সেইখানিই নামিয়ে নিতাম, আর ক্রমাগত পড়ে যেতাম। হয়তো দশটা কথার মধ্যে একটা কথারও মানে জানতাম না, পুরো এক পৃষ্ঠার মধ্যে দুটো কথাও বুঝতে পারতাম না। শুধু কথাগুলিই আমাকে মুগ্ধ করতো। কি পড়ছি সেদিকে বেশী মনোযোগ দিতাম না। কিন্তু আমার মনে সে সময়ে সব জিনিস নিশ্চয় খুব সহজেই ছাপ ফেলতে পারতো, কারণ এমন অনেক শব্দ ও সম্পূর্ণ বাক্য আমার মনে রয়ে গিয়েছিল যার অর্থ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। পরে যখন আমি কথা বলতে ও লিখতে শুরু করলাম, অতি স্বাভাবিক ভাবেই এই সব শব্দ ও বাক্য আমার মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে উঠতো। আমার শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য দেখে বন্ধুবান্ধবেরা অবাক হয়ে যেতেন। এই সময়ে আমি নিশ্চয় বহু বই-এর কিছু কিছু অংশ (সেই প্রথম যুগে আমি বোধ হয় একখানা বইও শেষ পর্যন্ত পড়িনি) এবং বহু কবিতা এই রকম করে না বুঝে-সুঝে পড়ে ফেলেছিলাম। তারপর আমি Little Lord Fauntleroy বইখানি আবিষ্কার করি। এই বোধ হয় প্রথম উল্লেখযোগ্য বই যা আমি মানে বুঝে পড়ি।

একদিন আমার শিক্ষয়িত্রী দেখতে পেলেন, লাইব্রেরীর এক কোণে বসে আমি Scarlet Letter বইখানির পাতা খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা অধ্যয়ন করছি। আমার তখন বয়স আট বছরের কাছাকাছি। আমার মনে আছে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বালিকা পার্ল্-কে আমার পছন্দ হয় কি না। তা ছাড়া কয়েকটি কথার মানে আমি বুঝতে পারছিলাম না, তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন একটি বালকের সম্বন্ধে লেখা চমৎকার একটি গল্প তাঁর কাছে আছে। আমার নিশ্চয় সেটি Scarlet Letter-এর চেয়ে ভালো লাগবে। বইখানির নাম তিনি বললেন Little Ford Fauntleroy; আর আমাকে কথা দিলেন যে, পরের গ্রীষ্মকালে তিনি আমাকে সেখানি পড়ে শোনাবেন। কিন্তু আগস্ট মাসের আগে আমরা গল্প পড়া আরম্ভ করতে পারি নি। আমার সমুদ্রতীর বাসের প্রথম ক'টি সপ্তাহ আবিষ্কারের আনন্দে ও উত্তেজনায় এমন পরিপূর্ণ হয়ে ছিল যে, দুনিয়ায় সমস্ত বই-এর অস্তিত্বের কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর আমার শিক্ষয়িত্রী অল্প কিছুদিনের জন্য আমাকে একা রেখে বস্টনে তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে চলে গিয়েছিলেন।

তিনি ফিরে আসবার পর প্রায় অবিলম্বেই আমরা Little Lord Fauntleroy গল্পটি পড়তে শুরু করলাম। এই শিশুর জীবনের মনোমুগ্ধকর কাহিনীর প্রথম কয়টি অধ্যায় আমরা যেখানে বসে পড়েছিলাম সেই স্থানটির কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে।—আগস্ট মাসের সুগোষ্ণ অপরাহ্ন। বাড়ী থেকে একটু দূরে দু'টি গম্ভীরাকৃতি পাইন গাছ থেকে টাঙানো দড়ির দোলনায় আমরা দু'জন একত্র বসে আছি। গল্প পড়বার জন্য যাতে অপরাহ্নে যথাসম্ভব বেশী সময় পাওয়া যায়, তাই মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বাসন-মাজা পর্বটি আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছিলাম।

যখন আমরা লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে দোলনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের চারদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফড়িং উড়ে এসে আমাদের কাপড় কামড়ে বসছিল। আমারও মনে আছে, আমার শিক্ষয়িত্রী জিদ ধরেছিলেন, ফড়িংগুলি সব কাপড় থেকে ছাড়িয়ে ফেলে তবে আমরা পড়তে বসবো। আমার কাছে অবশ্য এটা সময়ের অযথা অপব্যয় বলেই মনে হয়েছিল। দোলনাটি ঝরা পাইন-পাতায় ছেয়ে গিয়েছিল, কারণ আমার শিক্ষয়িত্রী যখন অনুপস্থিত ছিলেন তখন কেউ সেটি ব্যবহার করে নি। সূর্যের কিরণ পাইন গাছগুলির উপর পড়ে তাদের ভিতরকার সুগন্ধ টেনে বার করছিল। সুরভি স্নিগ্ধ বাতাসে একটু সামুদ্রিক নোনতা আস্বাদ। আমি যে সব কথা বুঝতে পারবো না বলে তিনি জানতেন, গল্প পড়তে আরম্ভ করার আগে মিস্ সালিভান সেগুলি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আমরা পড়া শুরু করলাম। অপরিচিত শব্দ পেলেই তিনি তার মানে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। প্রথম প্রথম এমন অনেক শব্দ পাওয়া যেতে লাগলো যা আমি জানি না; কাজেই পড়ার কাজে ঘন ঘন ব্যাঘাত হতে লাগলো। কিন্তু প্রারম্ভিক ঘটনা-সংস্থানটি ভালো করে বুঝে নিতে পারা মাত্রই আমি এমন উন্মুখ আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনতে আরম্ভ করলাম যে, শব্দের মত তুচ্ছ জিনিসে আর আমার কোন লক্ষ্যই রইল না। শেষে এমন দাঁড়ালো যে, মিস্ সালিভান যখন একটু আধটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, তখন তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলাম। যখন তাঁর আঙুলগুলি এত ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে, আর একটা কথাও বানান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তখন আমি জীবনে প্রথম একটা তীব্র অভাববোধ অনুভব করলাম। বইখানি হাতে নিয়ে ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে তার অক্ষরগুলি অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সে ব্যাকুলতার কথা আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

এর পর আমার সাগ্রহ অনুরোধের ফলে মিঃ আনাগ্নস্ বইখানি উঁ অক্ষরে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন। এতবার আমি বইখানি পড়েছিলাম যে আমার প্রায় সব বইটা মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমার সমগ্র শৈশবকা এই Little Lord Fauntleroy আমার এক অতি মধুর ও মমতাম সহচর হয়ে ছিল। একঘেয়ে বর্ণনায় পাঠকেরা বিরক্ত হতে পারেন জেনে এত কথা বলে ফেললাম, কারণ আমার পূর্বেকার বই-পড়ার অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ও বিশৃঙ্খল স্মৃতির তুলনায় এই বইখানি পড়ার স্মৃতি আমা মনে জীবন্ত হয়ে আছে।

বই সম্বন্ধে আমার সত্যকার কৌতূহলের সূত্রপাত হয় এই Littl Lord Fauntleroy পড়া থেকে। এর পরের দুই বৎসরে বাড়ীতে এব বস্টনপ্রবাসকালে আমি অনেক বই পড়ে ফেলি। সব বই-এর নাম আমা মনে নেই,—কোনখানির পর কোনখানি পড়েছিলাম তাও মনে নেই। কিন্তু অন্যান্য বই-এর সঙ্গে, Greek Heroes, লা ফোঁতেনের "উপকথা", হথর্নে Wonder Book, "বাইবেলের গল্প", ল্যাম্বের Tales from Shakespeare, ডিকেন্সের A Child's History of England, "আরব্যোপন্যাস", The Swiss Family Robinson, The Pilgrim's Progress, Robinson Crusoe, Little Women ও Heidi—এই বইগুলিও যে পড়েছিলাম সে কথা মনে আছে। সর্বশেষে উল্লিখিত চমৎকার ছোট গল্পটি পরে জার্মাণ ভাষাতেও পড়েছিলাম। লেখাপড়া ও খেলার ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পেতাম তার মধ্যে আমি এই সব বই পড়তাম,—যত পড়তাম ততই গভীরতর আনন্দের সন্ধান পেতাম। এসব বই আমি বেশী খুঁটিয়ে পড়তাম না, বিচার-বিশ্লেষণও করতাম না। লেখা ভালো কি মন্দ তা আমি বুঝতাম না; কোন্ বই-এর রচনাশৈলী কেমন বা কোন্‌টি কার লেখা তা নিয়ে মাথা ঘমাতাম না। বইগুলি তাদের আনন্দভাণ্ডার আমার সামনে

উজাড় করে করে ঢেলে দিত ; আমিও তা গ্রহণ করতাম,—যেমন করে আমরা আকাশের সূর্যালোক অথবা বন্ধুবান্ধবের ভালোবাসা গ্রহণ করি। Little Women বইখানি আমার খুব ভালো লাগতো, কারণ এর ভিতর দিয়ে চোখে দেখতে পায় ও কানে শুনতে পায় এমন সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি একটা একাত্মবোধ অনুভব করতাম। আমার জীবন বহু দিক দিয়ে বড় সঙ্কীর্ণ ছিল। কাজেই আমার জগতের বাইরে যে জগৎ আছে তার খবর সংগ্রহ করতে হলে অনেক সময় আমাকে বই-এর পাতার মধ্যেই খুঁজে নিতে হতো।

Pilgrim's Progress আমার বিশেষ ভালো লাগে না। বোধ হয় বইখানি আমি শেষ পর্যন্ত পড়িও নি। লা ফোঁতেনের "উপকথা"-ও আমার খুব ভালো লাগে না। প্রথম আমি এই উপকথাগুলির একটা ইংরাজি অনুবাদ পড়ি। কিন্তু পড়ে বিশেষ প্রীতিলাভ করতে পারি নি। পরে ফরাসী ভাষায় বইখানি আমি আবার পড়েছিলাম। কিন্তু লেখকের জীবন্ত শব্দচিত্রাঙ্কন ও ভাষার উপর অসামান্য অধিকার সত্ত্বেও এবারও কিছু বেশী ভালো লাগে নি। কেন তা বলতে পারি না, কিন্তু যে সব গল্পে জীবজন্তুকে দিয়ে মানুষের মত কথা বলানো ও কাজ করানো হয় সেগুলি পড়ে আমি কোনদিনই গভীর প্রীতিলাভ করতে পারি নি। জীবজন্তুর হাস্যকর ব্যঙ্গ চিত্রগুলিই আমার মন জুড়ে থাকে, নীতি-উপদেশ সেখানে প্রবেশ করবার পথ পায় না।

তা ছাড়া লা ফোঁতেন অতি কদাচিৎ আমাদের মনে উচ্চতর নীতিবোধ উদ্দীপিত করেন,—বোধ হয় কখনই করেন না। মনের যে মহত্তম তন্ত্রীগুলিতে তিনি আঘাত করতে পারেন তা হচ্ছে বিচারবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি। তাঁর সমস্ত উপকথার মধ্যে একটি মাত্র চিন্তাধারা প্রবাহিত : মানুষের সর্বপ্রকার নীতিবোধ একমাত্র স্বার্থবুদ্ধি থেকেই উদ্ভূত হয়, এবং এই স্বার্থবুদ্ধি যদি বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে মানুষের সুখের

পথে আর কোন বাধাই থাকতে পারে না। কিন্তু আমি যতটা বিচার-বিবেচনা করতে পারি তা থেকে মনে হয়, দুনিয়ার সমস্ত দুঃখকষ্টের মূলে আছে এই স্বার্থবুদ্ধি। হয়তো আমারই ভুল,—কারণ নরচরিত্র অধ্যয়ন করবার সুযোগ লা ফোঁতেনের যতটা জুটেছিল আমার তা কোনদিনই জুটবার সম্ভাবনা নেই। যাই হোক, তিক্তরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক উপকথাগুলির বিরুদ্ধে আমার বিশেষ কোন নালিশ নেই। কিন্তু যেগুলিতে বানর ও খেঁকশিয়ালীর মুখ দিয়ে বড় বড় তত্ত্বকথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছে সেইগুলি সম্বন্ধেই আমার প্রবল আপত্তি

কিন্তু The Jungle Book ও Wild Animals I Have Known বই দু'খানি আমার খুব ভালো লাগে। এই সব জীবজন্তুর কাহিনী আমি পরম কৌতূহলের সঙ্গে পড়ে থাকি, কারণ এখানে জীবজন্তুগুলি সত্য সত্যই জীবজন্তু, মানুষের ব্যঙ্গানুকৃতি নয়। তাদের ভালোবাসা ও হিংসাদ্বেষের বর্ণনায় মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে, তাদের রঙ্গরসের কাহিনী আমাদের মুখে হাসি ফোটায়, তাদের জীবনের শোকাবহ দুর্ঘটনায় আমরা অশ্রুমোচন করি। আর যদি তাদের জীবনকাহিনীর মধ্যে কোন নীতি-উপদেশ নিহিত থাকে, তা এতই সূক্ষ্ম যে আমাদের নজরে পড়ে না।

আমার মন স্বাভাবিক ভাবে এবং সানন্দে অতিপ্রাচীন যুগের ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রীস—প্রাচীন গ্রীস—আমার উপর এক রহস্যময় কুহকের মায়া বিস্তার করেছিল। কল্পনা করতাম, এখনও সেই সব প্রাচীন দেবদেবী পৃথিবী-বক্ষে বিচরণ করে বেড়ান, মানুষের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো তাঁদের জন্য মনের গোপন পুরে মন্দির রচনা করতাম। যেখানে যত বনদেবী, অর্ধদেবতা ও মহাবীর ছিলেন সবাইকে আমি চিনতাম, সবাইকে ভালোবাসতাম। না, ঠিক সবাইকে নয়, কারণ জেসন ও মিডিয়ার

লোভ ও নিষ্ঠুরতা আমার কাছে অমার্জনীয় বলে মনে হতো। অবাক হয়ে ভাবতাম, দেবতারা এদের অন্যায় কাজ করতেই বা দেন কেন, আর পরে অন্যায়াচারণের জন্য শাস্তিই বা দেন কেন? এ রহস্যের এখনও সমাধান করে উঠতে পারি নি। এখনও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কেন—

ঈশ্বর নির্বাক হয়ে থাকেন,
আর তাঁর সময়-দিয়ে-গড়া মহাগৃহের মধ্যে
পাপ চোরের মত ঘুরে বেড়ায়,
মুখে ক্রূর হাসি নিয়ে?

"ইলিয়ড" পাঠের ফলেই গ্রীস আমার কল্পনার স্বর্গ হয়ে দাঁড়ালো। মূল গ্রন্থ পাঠের পূর্বেই ট্রয় নগরীর কাহিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সুতরাং ব্যাকরণের দেউড়ি পার হবার পর গ্রীক ভাষার শব্দগুলি নিংড়ে তার ভিতরকার রস আহরণ করা আমার পক্ষে বিশেষ শক্ত হয় নি। শ্রেষ্ঠ কাব্য, তা সে গ্রীক কিংবা ইংরাজি যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, সংবেদনশীল হৃদয় ছাড়া অন্য কোন ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে না। যে সব শিক্ষক ও সমালোচক প্রবরেরা বিচার-বিশ্লেষণ, অর্থারোপ ও শ্রমসাধ্য টীকাভাষ্যের বাড়াবাড়ি করে মহাকবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যরাজিকেও পাঠকদের অপ্রিয় করে তোলেন, তাঁরা যদি এই সরল সত্য কথাটি মনে রাখতেন তাহলে বড়ো ভালো হতো। ভালো কবিতার অর্থ বুঝবার জন্য বা রস উপভোগ করবার জন্য প্রত্যেকটি শব্দের সংজ্ঞানির্দেশ, ধাতুনির্ণয় বা অন্বয়-প্রকরণের কোন প্রয়োজন নেই। "ইলিয়ড" কাব্যের মধ্যে আমি সারা জীবনে যতটুকু সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সন্ধান করতে পারবো আমার সুপণ্ডিত অধ্যাপকেরা যে তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছেন, তা আমি জানি। কিন্তু আমি বেশী লোভী নই। অপরে যদি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান আহরণ করতে পারে তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের জ্ঞানের পরিমাণ

বিপুল এবং পরিধি বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও এই অক্লান্ত গম্ভীর মহাকাব্য-পাঠের আনন্দ পরিমাপ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়,—আমার পক্ষেও নয়। "ইলিয়ড"-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যাংশগুলি যখন আমি পাঠ করি, তখন আমার অন্তরাত্মার মধ্যে এমন একটা ভাবাবেগ অনুভব করি যা আমাকে আমার জীবনের সংকীর্ণ বাধাবহুল পরিবেশ থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যায়। আমার সর্ববিধ শারীরিক বৈকল্যের কথা আমি ভুলে যাই; আমার জগৎ হয়ে ওঠে ঊর্ধ্বমুখী; সমগ্র ব্যোমরাজ্যের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ব্যাপ্তির মালিক হই আমি।

"ইনিড" কাব্য আমি অবশ্য এতখানি পছন্দ করি না, কিন্তু এ কাব্যখানিও আমার সত্য সত্যই ভালো লাগে। যতদূর সম্ভব টীকাভাষ্য ও অভিধানের সাহায্য বর্জন করেই এই কাব্য আমি পড়ে থাকি, এবং যে অংশগুলি আমার বিশেষ ভালো লাগে সেগুলিকে অনুবাদ করে আমি সর্বদাই খুব আনন্দ পেয়ে থাকি। স্থানে স্থানে ভার্জিলের শব্দচিত্রাঙ্কন অতি অপূর্ব। কিন্তু তাঁর কাব্যের দেবতা ও মানুষেরা প্রেম, করুণা, ভাবাবেগ ও দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ নানা দৃশ্যের ভিতর দিয়ে একটা শান্ত মাধুর্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে,—মনে হয় যেন এলিজাবেথীয় যুগের মুখোস-নাট্যের কুশীলবদের দেখছি। অনুরূপ ক্ষেত্রে "ইলিয়ড" কাব্যের চরিত্রেরা হয়তো তিন তুড়িলাফ দিয়ে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যেত। ভার্জিল প্রশান্ত ও সুমধুর,—যেন চন্দ্রালোকে দৃষ্ট আপোলোদেবের মর্মরমূর্তি; হোমার যেন এক পরমসুন্দর প্রাণচঞ্চল যুবাপুরুষ,—তাঁর সর্বাঙ্গ সূর্যালোকে ঝলমল করছে, মাথার কেশপাশ বায়ুবেগে বিপর্যস্ত।

কাগজ-কলমের পাখনা মেলে কত সহজে কতদূর উড়ে যাওয়া যায়! Greek Heroes থেকে "ইলিয়াড" পর্যন্ত যাত্রা আমার একদিনে সম্পন্ন হয়নি; যাত্রাপথ খুব সুগমও ছিল না। আমি যতদিন ধরে ব্যাকরণ ও

অভিধানের গোলকধাঁধাঁর মধ্যে ক্লান্ত চরণে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি কিংবা জ্ঞান-পিপাসুদের সর্বনাশের জন্য স্কুলে কলেজে পরীক্ষা নামধেয় যে মারাত্মক ফাঁদগুলি পাতা হয় বার বার তার মধ্যে পড়েছি, ততদিনে বহুবার ভূপ্রদক্ষিণ করে আসা যেত। উদ্দেশ্য বিচার করে দেখলে বোধ হয় এই রকম কষ্টসাধ্য তীর্থযাত্রার সার্থকতা ছিল, কিন্তু পথের বাঁকে মাঝে মাঝে নানা অপ্রত্যাশিত আনন্দ-বস্তুর সাক্ষাৎ মেলা সত্ত্বেও আমার মনে হতো, এ যাত্রার বোধ হয় কোনদিন শেষ হবে না।

অর্থ বুঝতে পাবার অনেক আগেই আমি বাইবেল পড়তে আরম্ভ করি। আজ অবশ্য ভাবলে বিস্ময় অনুভব করি, কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন বাইবেলের ভাষার অনবদ্য সুরঝঙ্কার আমার মনের কানে বিন্দুমাত্র আনন্দ সঞ্চার করতে পারতো না। মনে পড়ে, একদিন রবিবার সকালবেলায় খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। হাতে কোন কাজ না থাকায় আমার খুড়তুতো বোনকে অনুরোধ করলাম বাইবেল থেকে একটা গল্প পড়ে শোনাতে। তিনি অবশ্য ভাবেন নি যে আমি কিছু বুঝতে পারবো, কিন্তু তবু আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য জোসেফ ও তাঁর ভ্রাতাদের কাহিনীটি আমার হাতে বানান করে দিতে আরম্ভ করলেন। যে কারণেই হোক, গল্পটি আমার মোটেই ভালো লাগে নি। ভাষার অদ্ভুত ভঙ্গি ও একই কথার বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে সবটাই কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল ;—কোন্ সুদূর ক্যানাল দেশে কবে কি ঘটনা ঘটেছিল তারই বর্ণনা! ফলে, জোসেফের ভ্রাতৃগণ সেই বহুবর্ণের কোটটি নিয়ে জেকবের শিবিরে এসে গর্হিত মিথ্যাভাষণ করবার অনেক আগেই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুম-বুড়োর দেশে বেড়াতে চলে গিয়েছিলাম। কেন যে পুরাণের কাহিনী আমার এত মনোমুগ্ধকর বলে মনে হতো আর বাইবেলের গল্প এত নীরস লাগতো, তা আমি এখনও বুঝতে পারি না। সম্ভবতঃ এর একটা কারণ এই যে, বস্টন সহরে কয়েকজন গ্রীকজাতীয় লোকের সঙ্গে

আমায় আলাপ হয়েছিল এবং স্বদেশের পৌরাণিক উপাখ্যান সম্বন্ধে এঁদের সোৎসাহ অনুরাগ আমাকেও অনুপ্রেরিত করে তুলেছিল। অপর পক্ষে একজনও ইহুদী বা মিশরবাসীর সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয় নি। এই থেকেই আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, এরা সবাই সভ্যতাহীন বর্বর, এবং এদের সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বাইবেলে বর্ণিত আছে সবই গালগল্প মাত্র। এই কারণেই বোধ হয় এদের ভাষা এত পুনরুক্তি দোষদুষ্ট এবং এদের নামগুলি এত অদ্ভুত। মজার কথা এই যে, গ্রীক নামের পদবীগুলিকে আমার কখনও "অদ্ভুত" বলে মনে হয় নি।

কিন্তু এর পর আমি বাইবেলের মধ্যে যে অপরিসীম সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বৎসরের পর বৎসর ধরে আমি বাইবেল পড়েছি,—যত পড়েছি ততই মনের মধ্যে নব নব আনন্দ ও অনুপ্রেরণা অনুভব করেছি। জীবনে আর কোন বইকে আমি এত ভালোবাসি নি। তথাপি বাইবেলের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা পড়লেই আমার মনের সহজাত সংস্কারগুলি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। প্রয়োজনের চাপে বাধ্য হয়ে আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাইবেল পড়েছি। কিন্তু এ জন্য আমি দুঃখিত। গ্রন্থের ইতিহাস ও উৎপত্তি সম্বন্ধে হয়তো আমি অনেক তথ্য জানতে পেরেছি, কিন্তু এর ফলে যে সব অতি অপ্রীতিকর ব্যাপারের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে সেগুলি না জানলেই বোধ হয় ছিল ভালো। আমার মনে হয়, অতীত যুগের সাহিত্য থেকে কুৎসিত ও বর্বর অংশগুলি সব ছেঁটে ফেলা উচিত। এ বিষয়ে আমি মিঃ হাউয়েলসের সঙ্গে একমত। কিন্তু এ করতে গিয়ে যদি এই সব মহাগ্রন্থের অন্তর্নিহিত শক্তি বা সত্যের কোন প্রকার হানি হয়, তাহলে আর সবাই-এর মত আমিও প্রবল আপত্তি তুলবো।

এস্থারের কাহিনীর সারল্য ও ভয়াবহ স্পষ্টতা মনকে শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যের

রূসে পরিপ্লুত করে তোলে। এস্থার যেখানে তার পাপিষ্ঠ স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই দৃশ্যটির চেয়ে নাটকীয় দৃশ্য আর কোথায় আছে? সে জানে, সম্রাট ইচ্ছা করলেই তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন; তাঁর ক্রোধবহ্নি থেকে কেউ তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। তথাপি নারীসুলভ ভীতিকে অগ্রাহ্য করে মহত্তম জাতিপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনে তার একটিমাত্র চিন্তা: "যদি আমি মরি, আমি একাই মরবো; কিন্তু আমি বাঁচলে আমার সমগ্র জাতি বাঁচবে।"

তারপর রুথের কাহিনী। এমন কাহিনী শুধু প্রাচ্য দেশেই সম্ভব। কিন্তু এই কাহিনীতে বর্ণিত সরল পল্লীবাসীদের জীবন আর পারস্যের রাজধানীর অধিবাসীদের জীবনের মধ্যে কত পার্থক্য!—বাতাসে শস্যক্ষেত্রের উপর ঢেউ তুলছে; তার মধ্যে অন্যান্য শস্যকর্তকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে রুথ। তার চরিত্র এমন একনিষ্ঠ, তার হৃদয় এত কোমল যে তাকে না ভালোবেসে থাকা অসম্ভব। সেই অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর যুগের আঁধার নিশীথিনীর মধ্যে রুথের নিঃস্বার্থপর রমণীয় চরিত্র সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দেদীপ্যমান। রুথের প্রেম সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত ও সুদূর প্রসারী জাতি বিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম। এমন প্রেম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দুর্লভ।

বাইবেল পাঠ করে আমি এই সুগভীর সান্ত্বনার আশ্বাস লাভ করি যে, "চোখ দিয়ে যা দেখতে পাওয়া যায় সবই ক্ষণস্থায়ী, যা দেখতে পাওয়া যায় না তাই শুধু চিরন্তন।"

বই ভালোবাসতে শেখার পর এমন সময় আমার জীবনে কখনও আসে নি যখন আমি শেক্‌স্‌পীয়রকে ভালোবাসিনি। ঠিক কখন যে আমি ল্যাম্বের Tales from Shakespeare পড়তে আরম্ভ করি তা আমার মনে নেই। কিন্তু একথা মনে আছে যে শিশুর বুদ্ধি আর শিশুর বিস্ময় নিয়েই বইখানি আমি প্রথম পড়ি। মনের উপর সবচেয়ে গভীর ছাপ রেখেছিল

"ম্যাকবেথ"। একবার মাত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি চিরদিনের মত স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। এরপর বহুদিন ধরে ভূতপ্রেত আর ডাইনির দল স্বপ্নের মধ্যেও আমার পিছু ধাওয়া করে বেড়াত। ছুরিকাখানি আর লেডি ম্যাকবেথের ছোট শুভ্র হাতখানি আমি দেখতে পেতাম,—স্পষ্ট যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম। আর সেই হাতের উপরকার ভয়াবহ শোণিতচিহ্ন রাণীর নিজের কাছে যতখানি বাস্তব ছিল, আমার কাছেও ঠিক ততখানি বাস্তব হয়ে উঠতো।

"ম্যাকবেথ" পড়ার অল্প কিছুদিন পরেই আমি "কিং লিয়ার" পড়ি। যে দৃশ্যে গ্লস্টার-এর চোখ উপড়ে ফেলা হয় সেই দৃশ্যটি পড়তে পড়তে আমি যে আতঙ্কের বিভীষিকা অনুভব করেছিলাম তা জীবনে ভুলতে পারবো না। ক্রোধে আমি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম, একটি আঙুলও নাড়তে পারছিলাম না, দুই রগের শিরা দব্ দব্ করছিল। বহুক্ষণ ধরে আমি নিশ্চল হয়ে বসেছিলাম। আমার মত শিশুর পক্ষে যতখানি ঘৃণা অনুভব করা সম্ভব সব যেন আমার হৃদয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছিল।

শাইলক ও শয়তান এই দুটি চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় আমার বোধ হয় একই সময়ে হয়েছিল। কারণ বহুদিন এদের একজনের নাম করলেই আর একজনের কথা আমার মনে পড়তো। মনে আছে, এদের জন্য আমি দুঃখ অনুভব করতাম। আমার মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, এরা বোধ হয় ইচ্ছা করলেও ভালো হতে পারতো না, কারণ কেউ এদের সাহায্য করতে কিংবা এদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে প্রস্তুত ছিল না। এদের নির্জলা নিন্দাবাদ করতে এখনও আমার কোথায় যেন বাধে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পৃথিবীর যত শাইলক ও জুডাসের দল, এমন কি স্বয়ং শয়তান

পর্যন্ত, প্রত্যেকে যেন বিরাট মণ্ডল-চক্রের এক একটি ভাঙা অংশ। একদিন আর কিছুই ভাঙাচোরা থাকবে না; অখণ্ড মণ্ডলের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

খুবই বিস্ময়ের কথা এই যে, প্রথম শেক্‌স্‌পীয়র পাঠের ফলে আমার মনে এতগুলি অপ্রীতিকর স্মৃতি জমা হয়ে উঠেছিল। যে সব কৌতুকোজ্জল, প্রসাদগুণান্বিত, কল্পনাবহুল নাটক এখন আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, তখন সেগুলি আমার মনের উপর আদৌ কোন প্রভাব বিস্তার করে নি। শৈশব-জীবনের অতি পরিচিত আনন্দ ও স্ফূর্তির আলোক এই সব নাটকে প্রতিফলিত হতে দেখেছিলাম বলেই বোধ হয় এমন হয়েছিল। কিন্তু "শিশুর স্মৃতির চেয়ে খামখেয়ালী জিনিস আর কিছুই নেই; কি যে ধরে রাখবে আর কি যে ভুলে যাবে তার কোনই স্থিরতা নেই।"

তারপর আমি শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলি বহুবার পড়েছি,—কোন কোন অংশ আমার মুখস্থও হয়ে গেছে। কিন্তু কোন্ নাটকখানি আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, এ প্রশ্নের কোন উত্তর আমি দিতে পারবো না। মনের বহু বিচিত্র গতিগতি অনুযায়ী আমি শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা থেকে বহুবিচিত্র আনন্দ আহরণ করে থাকি। নাটকগুলির ন্যায় ছোট ছোট গান ও সনেটগুলিও আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ,—চিরনবীন, চিরচমৎকার। শেক্‌স্‌পীয়রকে আমি খুবই ভালোবাসি; কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচক ও ভাষ্যকারেরা তাঁর লেখায় যত বিভিন্ন প্রকারের অর্থ তাৎপর্য আরোপ করেছেন, সব বুঝে বুঝে পড়া অত্যন্ত ক্লান্তিকর কাজ। প্রথমে এই সব ব্যাখ্যা আমি মনে রাখবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তার ফলে ভগ্নোৎসাহ ও বিরক্ত হয়ে পড়তাম। সুতরাং আমি গোপনে আমার মনের সঙ্গে একটা চুক্তি করলাম—আর এ চেষ্টা করবো না। অধ্যাপক কিট্‌রিজের কাছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বার সময় সম্প্রতি আমি এই চুক্তি ভঙ্গ করেছি। আমি জানি, শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলীতে এবং পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা আমার নিজের বুদ্ধির অগম্য।

আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হয়ে চিন্তা ও সৌন্দর্যের নূতন নূতন জগৎ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে দেখলে এখন আমি খুব আনন্দ অনুভব করি।

কাব্যের পরই আমি ভালোবাসি ইতিহাস। নীরস তথ্য ও নীরসতর তারিখের তালিকা থেকে গ্রীনের পক্ষপাতশূন্য ও বর্ণনাচাতুর্যময় History of the English People পর্যন্ত, ফ্রিম্যানের History of Europe থেকে এমার্টনের Middle Ages পর্যন্ত, যে ইতিহাসের বই আমি হাতে পেয়েছি তাই পড়ে ফেলেছি। সুইনটনের World History বইখানি পড়ে সর্বপ্রথম আমার মনে ইতিহাসের মূল্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। আমার ত্রয়োদশ জন্মতিথিতে আমি এই বইখানি উপহার পাই। আজকাল বোধ হয় বইখানিকে আর প্রামাণিক বলে গণ্য করা হয় না। তথাপি আমার নিজস্ব পুস্তকভাণ্ডারের বহুমূল্য রত্ন হিসাবেই আমি একে রক্ষা করেছি। এই বই পড়ে আমি প্রথম জানতে পারি কেমন করে বিভিন্ন জাতির মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বড় বড় নগর গড়ে তুলেছিল; কেমন করে ধরিত্রীচারী দানবের মত কয়েকজন মহাশক্তিশালী সম্রাট দুনিয়ায় সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল,—কেমন করে তাদের মুখের একটি কথায় লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে সুখের তোরণ উন্মুক্ত হয়ে যেত, আবার লক্ষ লক্ষ অপর লোক চিরদিনের জন্য সর্বসুখ থেকে নির্বাসিত হতো; কেমন করে ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপন করেছিল এবং ভবিষ্যৎযুগের মহত্তর প্রকর্ষের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল; কেমন করে এক ক্ষয়িষ্ণু অবনত যুগের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সভ্যতার মৃত্যু হয়েছিল, আর কেমন করে উত্তরাঞ্চলের মহত্তর জনগণের মধ্যে আবার সেই সভ্যতা পুনর্জন্ম লাভ করেছিল; এবং কেমন করে বর্তমান যুগের মহান মনীষীগণ স্বাধীনতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও শিক্ষার সাহায্যে সমগ্র জগতের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কলেজে অধ্যয়নের ফলে জার্মান ও ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হয়েছে। জীবন ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই জার্মাণ জাতি শক্তিকে সৌন্দর্যের উর্দ্ধে এবং সত্যকে প্রচলিত রীতিনীতির উর্দ্ধে স্থান দিয়ে থাকে। তারা যা কিছু করে তার মধ্যেই একটা প্রচণ্ড শক্তি ও বীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা যখন কথা বলে, তখন অপরকে মোহিত করার জন্য বলে না। অন্তর্নিহিত চিন্তাবহ্নির প্রদাহ বাইরে প্রকাশ না করতে পারলে বুক ভেঙে যাবে, এইজন্যই তারা কথা বলে।

তা ছাড়া জার্মাণ সাহিত্যে একটা চমৎকার বাক্‌সংযম আছে। এই গুণটি আমার বড় ভালো লাগে। নারীর নিঃস্বার্থ প্রেমের যে পাপ-স্খালনী শক্তি আছে জার্মাণ সাহিত্যে আমি তার একটা স্বীকৃতি দেখতে পাই। এইটিই এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গৌরব। জার্মান সাহিত্যের সর্বত্র এই চিন্তাধারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। গ্যেটের Faust-এর মধ্যেও নিগূঢ়ার্থক ভাষায় এই চিন্তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই :

বিশ্বের যা কিছু নশ্বর বস্তু,
সবই যেন ঈশ্বর-প্রেরিত এক একটি সংকেত।
পৃথিবীর দৈন্য
এর মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করে।
অনির্বচনীয় ব্যাপার
এর মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়।
নারীর আত্মা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে,—
উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে।

আমি যে সব ফরাসী লেখকদের লেখা পড়েছি তাঁদের মধ্যে মলিয়ারে ও রাসিন-কে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে। বলজ্যাকের রচনার মধ্যে অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে। মেরিমে-র রচনা থেকে কোন কোন

অংশ পড়তে পড়তে মনে হয় যেন শরশরীরে সমুদ্রের শীতল হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে। আলফ্রেড দ্য মুসে-কে কিন্তু পছন্দ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ভিক্টর হুগোর লেখা আমার ভালো লাগে ; তাঁর প্রতিভা, তাঁর প্রকাশভঙ্গির প্রাখর্য, তাঁর রোম্যানটিক ভাবধারা—সবই আমি উপভোগ করি,—যদিও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি আমার কাছে দেবতাস্থানীয় নন। কিন্তু গ্যেটে, হুগো, শিলার—সমস্ত মহান জাতির সমস্ত মহান কবি—এঁদের কাজ হচ্ছে আমাদের জন্য শাশ্বত সত্যের ভাষ্য রচনা করা। আমার মন সর্বদা সশ্রদ্ধভাবে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই সব আনন্দরাজ্যে গিয়ে পৌঁছায় যেখানে সত্য, শিব ও সুন্দর এক হয়ে বিরাজ করছে।

আমার লেখক বন্ধুদের কথা নিয়ে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললাম। তবু কিন্তু যে সব লেখকদের আমি সবচেয়ে ভালোবাসি শুধু তাঁদের কথাই বলছি। এ থেকে হয়তো কেউ কেউ চট্ করে ভেবে বসবেন, আমি খুব কম লেখককেই ভালোবাসি : এ বিষয়ে আমার মধ্যে গণতান্ত্রিক উদারতার অভাব আছে। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল। বহু বিভিন্ন কারণে আমি বহু বিভিন্ন লেখককে ভালোবাসি। আমি কার্লাইলকে ভালোবাসি তাঁর সতেজ রুক্ষতার জন্য, সর্বপ্রকার কাপট্যের প্রতি তাঁর অপরিসীম ঘৃণার জন্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে ভালোবাসি তিনি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একাত্মবোধ শিক্ষা দিয়েছেন বলে। হুডের অদ্ভুত অদ্ভুত রচনাভঙ্গি ও চিন্তার অপ্রত্যাশিত মারপ্যাঁচ আমি খুব আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করি। হেরিক্কের সেকেলে ধরণের সৌকুমার্য এবং তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লিলি ও গোলাপের সুরভি আমাকে বড়ই আনন্দ দেয়। হুইটিয়ারকে আমি পছন্দ করি তাঁর উৎসাহের উচ্ছ্বাস ও নৈতিক ঋজুতার জন্য। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। আমাদের বন্ধুত্বের সুমধুর স্মৃতি তাঁর কাব্যপাঠের আনন্দকে দ্বিগুণ করে

তোলে। মার্ক টোয়েনকে আমি ভালোবাসি,—তাঁকে ভালোবাসে না এমন কেউ কি কোথাও আছে? দেবতারাও তাঁকে ভালোবাসতেন। সেইজন্য তাঁর হৃদয়ে তাঁরা সর্বজ্ঞান পুঞ্জীভূত করে দিয়েছিলেন। তারপর পাছে তিনি এর ফলে বিশ্বনিন্দুক হয়ে পড়েন সেই ভয়ে প্রেম ও বিশ্বাসের রামধনু দিয়ে তাঁরা তাঁর হৃদয়টিকে বেঁধে দিয়েছিলেন। স্কটকে আমি ভালোবাসি তাঁর সজীবতা, সাহস ও উদার সাধুতার জন্য। অনেক সাহিত্যিক আছেন যাঁদের হৃদয়ের আবেগ আশাবাদের সূর্যকিরণে সমুদ্ভাসিত আনন্দ ও বিশ্ব-প্রীতির বারিধারার ন্যায় নিয়ত প্রবাহিত হয়;—কোথাও বা অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ আকস্মিক আবর্ত রচনা করে, কোথাও আবার করুণা ও সহানুভূতির সুশীতল শীকরোচ্ছ্বাস উৎসারিত হয়। লাওয়েল এঁদের একজন। এঁদের সকলকেই আমি ভালোবাসি।

বস্তুতঃ সাহিত্যের মধ্যেই আমি আমার কল্পলোকের সন্ধান পেয়েছি। এই রাজ্যের নাগরিক হিসাবে আমি অক্ষুণ্ণ অধিকার ভোগ করে থাকি। অঙ্গহীনতার কোন বাধা আমাকে এই সব পুস্তকরূপী নর্মসহচরদের প্রসন্ন-মধুর আলাপনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। অতি সরল স্বাভাবিক ভাবে এঁরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এঁদের "বিপুল প্রেম ও স্বর্গীয় ঔদার্যের" তুলনায় আমি যা কিছু শিখেছি, যা কিছু আমাকে শেখানো হয়েছে, সবই অতি তুচ্ছ, অতি হাস্যকর বলে মনে হয়।

বাইশ

আগের পরিচ্ছেদে আমি শুধু বই-এর কথা বলেছি। আশা করি পাঠকেরা তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করে বসেন নি যে, বই পড়াই আমার একমাত্র আনন্দ। আমি বহু বিভিন্ন বিষয় থেকে আনন্দ আহরণ করে থাকি, বহু বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুকে যোগ দিয়ে থাকি।

এই কাহিনীর মধ্যে একাধিকবার আমি আমার পল্লীপ্রীতি ও ঘরের বাইরে খেলাধুলার প্রতি অনুরাগের কথা উল্লেখ করেছি। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখনই নৌকা বাইতে ও সাঁতার দিতে শিখেছিলাম। আজকাল গ্রীষ্মকালে আমি যখন ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তর্বর্তী রেন্থাম নামক স্থানে বাস করি তখন প্রায় সব সময় নৌকাতেই থাকি। আমার বন্ধুবান্ধবেরা যখন সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তাঁদের নিয়ে নৌকা বেয়ে বেড়াতে আমি যত আনন্দ পাই এমন আর কিছুতেই পাই না। অবশ্য আমি ভালো করে নৌকার হাল ধরতে পারি না। সাধারণতঃ অন্য কেউ নৌকার পিছনে বসে হাল চালায়, আমি দাঁড় টানি। কখনও কখনও কিন্তু আমি বিনা হালেই নৌকা বেয়ে বেড়াই। জলো ঘাস, লিলিফুল আর তীর-ভূমির ঝোপঝাড়ের গন্ধের সাহায্যে পথ ঠিক করে নৌকা চালাতে ভারী মজা লাগে। আমি যে দাঁড়গুলি ব্যবহার করি সেগুলি চামড়ার বন্ধনী দিয়ে যথাস্থানে বাঁধা থাকে; আর জলের ধাক্কা থেকে আমি বুঝতে পারি, ঠিক সোজা করে দাঁড় ধরা হয়েছে কিনা। স্রোতের বিপরীত দিকে দাঁড় টানচি কিনা তাও আমি ঐ একই উপায়ে বুঝতে পারি। প্রতিকূল বাতাস ও তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করতে আমার খুব ভালো লাগে। ঢেউগুলি আলোয়

ঝক্‌মক্‌ করতে করতে দুলে দুলে ভেঙে পড়ছে! ছোট্ট বিশ্বস্ত নৌকাখানি তোমার ইচ্ছাশক্তি ও দৈহিক শক্তির বশবর্তী হয়ে তাদের উপর দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে! জলস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন প্রবল টান তুমি অনুভব করছো! এর চেয়ে বেশী স্ফূর্তি, এর চেয়ে বেশী আনন্দ আর কোথায় মিলবে?

ডোঙায় চড়ে লগি ঠেলে ঠেলে বেড়াতেও আমি খুব ভালোবাসি,—বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতে। কথাটা শুনে বোধ হয় আপনারা হাসছেন। আমি চোখে দেখতে পাই না;—কেমন করে পাইন বনের পিছন থেকে চাঁদ আকাশে এসে ওঠে, কেমন করে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আকাশ পার হয়ে যায়, কেমন করে আমাদের সামনে জলের উপর ভাঙা আলোর সমুজ্জ্বল পথ রচনা করে, কিছুই আমি দেখতে পাই না। কিন্তু চাঁদ যে আকাশে আছে তা আমি বুঝতে পারি,—বালিশের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে জলের মধ্যে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে মনে মনে কল্পনা করি, চলমান চাঁদের আলো-ঝিক্‌মিক্‌ পোশাকের মৃদু স্পর্শ অনুভব করছি। কখনও কখনও একটা অসমসাহসিক ছোট্ট মাছ আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে পালিয়ে যায়; হাতের উপর কুমুদ ফুলের সলজ্জ মৃদু চাপ অনুভব করি। প্রায়ই কোন পত্র-পল্লবে আচ্ছাদিত খাড়ির ভিতর থেকে বাইরে এসে পড়লে আমি সহসা আমার চারিদিকে বায়ুমণ্ডলের উন্মুক্ত প্রসার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি; একটা আলোকময় উষ্ণতা যেন আমাকে তার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে ফেলে। এই উষ্ণতা যে কোথা থেকে আসছে, সূর্যকরতপ্ত গাছপালা থেকে না নীচের জল থেকে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। সহরের মাঝখানেও কখনও কখনও আমার এই বিচিত্র অনুভূতি হয়েছে,—হিমশীতল ঝড়ের দিনেও হয়েছে, রাত্রি কালেও হয়েছে। ঠিক মনে হয় যেন, কার উত্তপ্ত ওষ্ঠাধর আমার মুখচুম্বন করে গেল।

পাল-তোলা নৌকায় করে সমুদ্রে ভ্রমণ আমার সব চেয়ে প্রিয় প্রমোদ। ১৯০১ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আমি নোভা স্কোশিয়ায় বেড়াতে যাই। সমুদ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আমি এখানে যেমন পেয়েছিলাম পূর্বে আর কখনও তেমন পাই নি। লংফেলো তাঁর Evangeline নামক চমৎকার কবিতায় যে অঞ্চলটিকে সৌন্দর্যের যাদুমন্ত্রে মোহময় করে তুলেছেন, প্রথমে কয়েকদিন আমরা সেই অঞ্চলে অবস্থান করি। তারপর মিস্ সালিভান ও আমি হ্যালিফ্যাক্সে যাই। গ্রীষ্মাবকাশের অধিকাংশ আমরা এইখানেই কাটাই। এখানকার উপসাগরটি ছিল আমাদের সুখস্বর্গ,—আনন্দ-নিকেতন। এর উপর দিয়ে পাল-তোলা নৌকায় করে বেড্‌ফোর্ড বেসিন, ম্যাক্‌ন্যাবের দ্বীপ, ইয়র্ক রিডাউট ও নর্থওয়েস্ট আর্ম পর্যন্ত যেতে যেতে কি অপূর্ব আনন্দই না আমরা উপভোগ করেছি! আর রাত্রিকালে সেই বিরাট নিস্তব্ধ যুদ্ধজাহাজখানার ছায়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকা নিয়ে বসে থাকা! সে কি অপরূপ প্রশান্তি! কি বিচিত্র অনুভূতি! সব জিনিসই চিত্তাকর্ষক, সব জিনিসই পরম সুন্দর বলে মনে হতো। যখনই সে সব কথা মনে পড়ে, তখনই হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে।

একদিন আমাদের একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। সেদিন নর্থওয়েস্ট আর্মে নৌকার বাইচ্ খেলা ছিল। বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ থেকে বহু নৌকা এসে তাতে যোগ দিয়েছিল। আমরা একখানা পাল-তোলা নৌকায় করে বাইচ্ দেখতে গিয়েছিলাম; সঙ্গে আরও অনেক নৌকা ছিল। শত শত ছোট ছোট নৌকা আমাদের খুব কাছেই এদিক ওদিক পাল তুলে দুলে দুলে বেড়াচ্ছিল। সমুদ্র শান্ত, নিস্তরঙ্গ। বাইচ্ খেলা শেষ হয়ে গেলে আমরা নৌকো ঘুরিয়ে বাড়ীমুখো ফিরছি, এমন সময় দলের একজন লক্ষ্য করলেন, বাহির-সমুদ্রের দিক থেকে একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মেঘখানা ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

দেখতে দেখতে সারা আকাশ ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। আমাদের ছোট্ট নৌকাখানি নির্ভীকভাবে ঝড়ের সম্মুখীন হলো। পালগুলি বাতাসে ফুলে ফেঁপে উঠছে, রশারশিতে জোর টান পড়েছে; মনে হচ্ছে যেন নৌকা বাতাসে ভর করে উড়ে চলেছে। কখনও বা ঢেউ-এর আবর্ত্তে পড়ে পাক খাচ্ছে, কখনও বা এক লাফে দানবের মত বিশালকায় এক তরঙ্গের চূড়ায় গিয়ে উঠছে, আবার পর মুহূর্তেই ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ও ফোঁস্ ফোঁসানির মধ্যে বিতাড়িত হয়ে নীচে নেমে পড়ছে। হঠাৎ প্রধান পালটি ছিঁড়ে খসে পড়লো। কখনও এ পাল কখনও ও পাল ধরে টানাটানি করে আমরা ঘন ঘন নৌকার গতিপরিবর্ত্তন করতে করতে এগুতে লাগলাম। প্রবল প্রতিকূল বাতাসে নৌকা একবার এদিকে একবার ওদিকে বিতাড়িত হতে লাগলো। আমরা প্রাণপণে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে যেতে লাগলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছিল, উত্তেজনায় হাত কাঁপছিল,—উত্তেজনায়, ভয়ে নয়। কারণ আমাদের হৃদয়ে ছিল পুরাকালের ভাইকিং-দের অদম্য সাহস। আমরা জানতাম আমাদের বিনি কাপ্তেন এ দুর্দৈব তাঁকে কাবু করতে পারবে না। তাঁর দৃঢ় হস্ত ও সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চক্ষুর্দ্বয়ের সাহায্যে তিনি এমন অনেক ঝড়ের মধ্য দিয়ে নৌকা চালিয়েছেন। বন্দরে বাঁধা বড় বড় জাহাজ ও রণতরীর পাশ দিয়ে আমরা যখন যাচ্ছিলাম, তখন তাদের নাবিকেরা আমাদের কাপ্তেনকে সেলাম করছিল, চীৎকার করে বাহবা দিচ্ছিল। কারণ এই একটিমাত্র ছোট পাল তোলা নৌকাই সেদিন সেই ঝড়ের মধ্যে বেরুতে সাহস করেছিল। অবশেষে শীতার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ক্লান্তদেহে আমরা আমাদের জেটিতে এসে পৌঁছুলাম।

গত গ্রীষ্মাবকাশটি আমি যাপন করেছি নিউ ইংলণ্ডের এক অতি মনোরম গ্রামের এক অতি রমণীয় নির্জ্জন স্থানে। ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত রেন্থাম নামক গ্রামটি আমার প্রায় সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত।

এই গ্রামে King Philip's Pond নামক পুকুরের ধারে "রেড্ ফার্ম্" নামে যে বাড়ীটি আছে সেটি মিঃ জে. ই. চেম্বারলিন ও তাঁর পরিবারের বাসভবন। বহু বৎসর আমিও এই বাড়ীতে বাস করেছিলাম। এই সব প্রিয় বন্ধুদের সদয় ব্যবহারের কথা ও তাঁদের সঙ্গে যে সুখের দিনগুলি কাটিয়েছিলাম তাদের কথা আমি আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এঁদের ছেলেমেয়েদের সুমধুর সাহচর্য আমার কাছে মহামূল্যবান বস্তু ছিল। আমি তাদের সব খেলাধুলায় যোগ দিতাম, তাদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম, দলের মধ্যে দাপাদাপি করে স্নান করতাম। ছোট ছোট শিশুদের মুখের আধো-আধো কথা, আমার বলা পরী ও যক্ষের গল্প, মহাবীর শিকারী ও চতুর ভালুকের গল্প ইত্যাদি শুনে তাদের সেই আনন্দ,—এসব কথা মনে পড়লে আজও প্রাণ খুসি হয়ে ওঠে। গাছপালা ও বুনো ফুলের ভিতরকার রহস্য মিঃ চেম্বারলেনই প্রথম আমাকে শিখিয়ে দেন। অবশেষে এমন হয়েছিল যে, ভালোবাসার গোপন কান পেতে আমি শুনতে পেতাম, ওক গাছের মধ্যে মৃত্তিকার রস প্রবাহিত হচ্ছে, ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখতে পেতাম, উজ্জ্বল সূর্যকিরণে পাতার পর পাতা প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে।

মৃত্তিকার অন্ধগুহায় আবদ্ধ শিকড়গুলি যেমন
তরুশীর্ষের আনন্দ-চাঞ্চল্যে অংশ গ্রহণ করে,—
প্রকৃতির সহজাত সহানুভূতির সাহায্যে
সূর্যকিরণ আর উন্মুক্ত বায়ু আর নভোচর জীবদের
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে,—
আমিও ঠিক তেমনি করে—
অদেখা জিনিসের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতাম।

পৃথিবীর সুরু থেকে এ পর্যন্ত মানব জাতির মনে যত প্রকার অনুভূতি ও হৃদয়াবেগের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই তা উপলব্ধি করবার

ক্ষমতা আছে,—এই আমার বিশ্বাস। প্রত্যেকটি ব্যক্তির অবচেতন মনের গহনে শস্যশ্যামলা ধরণী ও জলস্রোতের কলকল্লোলের স্মৃতি বিদ্যমান। বধিরতা বা অন্ধত্ব কিছুই তার কাছ থেকে পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত এই অমূল্য উপহার অপহরণ করতে পারে না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই শক্তিকে ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলা চলে। এ যেন একটা আত্মিক শক্তি,—এর সাহায্যে দেখা, শোনা, অনুভব করা, একসঙ্গে সবই সম্ভব।

রেস্থামে আমার বন্ধুস্থানীয় অনেক গাছপালা আছে। এদের একটি হচ্ছে এক বিশাল ওক বৃক্ষ,—আমার বিশেষ গৌরব ও গরিমার বস্তু। আমার সব বন্ধুবান্ধবদের আমি এই বনস্পতিটি দেখিয়ে নিয়ে আসি। King Philip's Pond-এর ধারে উঁচু পাড়ের উপর এই বৃক্ষটি অবস্থিত। যাঁরা গাছপালা সংক্রান্ত বিদ্যায় সুপণ্ডিত তাঁরা বলেন যে, বৃক্ষটি ঐস্থানে আটশো কি হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাজা ফিলিপ নামধেয় মহাবীর রেড্ ইণ্ডিয়ান দলপতি মৃত্যুর পূর্বে নাকি এই বৃক্ষেরই নিম্নে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত পৃথিবী ও আকাশকে দেখে নিয়েছিলেন।

আমার আর একটি বন্ধুস্থানীয় বৃক্ষ ছিল,—বিশালবপু ওক বৃক্ষটির চেয়ে এটি দেখতে অনেক বেশী ভব্যসভ্য; এর কাছে এগুনোও অনেক সহজ ছিল। এটি একটি লিণ্ডেন গাছ,—"রেড্ ফার্মের" সদর উঠানে জন্মেছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, এমন সময় আমি অনুভব করলাম কি একটা বিরাট বস্তু হুড়মুড় করে বাড়ীর গায়ে এসে পড়লো। কেউ কিছু বলবার আগেই আমি বুঝতে পারলাম, লিণ্ডেন গাছটি পড়ে গেল। আমরা বেরিয়ে দেখতে গেলাম। এই শক্তিশালী মহাবৃক্ষ এর আগে কত ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করেছে। সারাজীবন বীরের মত লড়াই করে অবশেষে আজ বীরের মত রণক্ষেত্রে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছে। দেখে আমার হৃদয় বেদনায় ভরে উঠলো।

কিন্তু একথা আমার ভুললে চলবে না যে, আমি বিশেষ করে গত গ্রীষ্মাবকাশের কথাই বলছিলাম। আমার পরীক্ষা শেষ হবা মাত্র মিস্ সালিভান ও আমি অবিলম্বে এই শ্যামল বিশ্রাম-কুঞ্জে চলে গেলাম। তিনটি সুন্দর সুন্দর হ্রদের জন্য রেন্থাম বিখ্যাত। এরই একটির ধারে আমাদের একখানি ছোট্ট বাড়ী আছে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ আলোকোজ্জ্বল দিনগুলি এখানে আমি ইচ্ছামত যাপন করতে পারতাম। কাজের চিন্তা, কলেজের চিন্তা, কোলাহলময় নাগরিক জীবনের চিন্তা—সব আমি মন থেকে মুছে ফেলেছিলাম। বাইরের পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটেছে—কত যুদ্ধ, কত মৈত্রী, কত সামাজিক দ্বন্দ্ব—তার কিছু কিছু প্রতিধ্বনি রেন্থামে আমাদের কানেও এসে পৌঁছুত। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে যে নিষ্ঠুর নিরর্থক সংগ্রাম চলছিল তার কথা আমরা শুনতে পেতাম; চারিদিকে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছিল তাও কিছু কিছু জানতে পারতাম। আমরা জানতাম যে, আমাদের এই স্বর্গোদ্যানের সীমানার বাইরে অসংখ্য মানুষ অবিরাম পরিশ্রম করে ইতিহাস রচনা করছে; ছুটির আনন্দ তারা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আমরা এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না। আমরা জানতাম, এ সব একদিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের চারি দিকের এই হ্রদ আর অরণ্য আর ডেজিফুলের তারা ছড়ানো মাঠ আর মধু-সুরভিত তৃণভূমি—এদের শেষ নেই, এরা কখনও ফুরিয়ে যাবে না।

শুধু চক্ষু-কর্ণের দ্বার দিয়েই সর্বপ্রকার অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে—এ কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অনেক সময় অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, একমাত্র শান-বাঁধানো ফুটপাথের অভাব ছাড়া, সহরের পথে বেড়ানো আর গ্রামের পথে বেড়ানোর মধ্যে কি পার্থক্য আমি অনুভব করতে পারি? তাঁরা ভুলে যান যে, আমার সমস্ত শরীর

আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। সহরের গম্ভীর নির্ঘোষ ও জনসমুদ্রের গর্জন আমার মুখের স্নায়ুমণ্ডলে এসে আঘাত করে। যে জনতাকে আমি দেখতে পাই না তার অবিরাম পদধ্বনি আমি অনুভব করতে পারি, তাদের কর্কশ কোলাহলে আমার মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে। নগরের কোলাহলময় রাজপথগুলি সর্বদাই নানা দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিরা এই সব দৃশ্য দেখতে পান। ফলে তাঁদের মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। আমার বেলায় তা হতে পারে না। সুতরাং কঠিন প্রস্তর পথের উপর ভারী ভারী গাড়ী চলবার ঘর্ঘরধ্বনি এবং নানা যন্ত্রের ঝঞ্ঝনা আমার স্নায়ুগুলোকে আরও বেশী পরিমাণে উৎপীড়িত করে তোলে।

পল্লী অঞ্চলে মানুষ দেখতে পায় শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য। শুধু টিঁকে থাকবার জন্য জনাকীর্ণ নগরের মধ্যে মানুষকে যে সুকঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় পল্লী অঞ্চলে তার চাপে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না। সহরের যে সব সঙ্কীর্ণ নোংরা পথের ধারে দরিদ্র জনগণ বাস করে আমি কয়েকবার সেখানে গিয়েছি। একদিকে বহু সজ্জন নীরোগ সুস্থ, সবল ও সুন্দর দেহ নিয়ে চমৎকার চমৎকার গৃহে পরম আনন্দে বাস করছেন, আর ওদিকে ওরা দণ্ডিত আসামীর দলের মত যারা জীবন বীভৎস, অন্ধকারময় বস্তির কুঠরীর মধ্যে বাস করছে,—দেহ কুৎসিত ও শীর্ণ হয়ে উঠছে, চরিত্র ভ্রষ্ট হয়ে উঠছে! চিন্তা করলেও ক্রোধে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। এই সব নোংরা গলির মধ্যে পালে পালে অর্ধনগ্ন অনশন ক্লিষ্ট শিশুর দল ঘুরে বেড়ায়। তাদের দিকে হাত বাড়ালে ভয়ে কুঁকড়ে সরে যায়,—মনে করে বুঝি মারবে! এই সব হতভাগ্য দেশের কাঙাল শিশুগুলির স্মৃতি চিরকাল আমার মনের কোণে জেগে আছে, চিরকাল আমার হৃদয়কে বেদনার্ত করে তুলেছে। এমন অনেক নরনারীও আছে যাদের হাড়-পাঁজরগুলো বেরুনো

বেঁকে দুমড়ে গেছে। আমি তাদের শক্ত কর্কশ হাতে হাত দিয়ে দেখেছি ;—বুঝতে পেরেছি, জীবন ভরে কি হাড়-ভাঙা খাটুনি তাদের অবিশ্রান্ত খাটতে হয়! শুধু ছেঁড়াছেঁড়ি, কামড়াকামড়ি! শুধু ব্যর্থতা,—বাধার পর বাধা! তাদের জীবনের কঠোর পরিশ্রম আর নামমাত্র সুযোগ সুবিধা—এ দুই-এর মধ্যে কি বিপুল ব্যবধান। আমরা প্রায়ই বলে থাকি, সূর্যের আলো আর খোলা হাওয়া ভগবানের দান ; এর জন্য কাউকে কোন দাম দিতে হয় না। কিন্তু সত্যই কি তাই ? ঐ যে সহরের আবর্জনাময় নোংরা গলি-ঘুঁজি,—ওখানে তো সূর্যের আলো প্রবেশ করে না! ওখানকার বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত দুর্গন্ধে ভরা। হায় মানুষ, কেমন করে তুমি তোমার ভাই-এর কথা ভুলে আছো ? কেমন করে তার পথের কাঁটা হয়ে আছো ? তার মুখে অন্ন নেই জেনেও কোন্ প্রাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছো, "আমাকে আজ আমার দৈনন্দিন খাদ্য দাও" ? সহরের কোলাহল, সহরের মহৈশ্বর্য, সহরের স্বর্ণমরীচিকা—সব ছেড়েছুড়ে মানুষ যদি আবার অরণ্য-প্রান্তরে ফিরে গিয়ে সরল সাধু জীবন যাপন করতে পারতো তাহলে কত ভালো হতো! তাহলে তাদের সন্তান-সন্ততি হতো মহান বনস্পতিরাজির মত সমুন্নতদেহ ; তাদের মনের চিন্তা হতো পথের পাশে ফোটা ফুলের মত পবিত্র মধুর।—সারা বছর সহরে কাজ করার পর আমি যখন প্রতিবার পল্লী-অঞ্চলে ফিরে যাই, তখন এই সব কথা আমি কিছুতেই না ভেবে থাকতে পারি না।

পায়ের নীচে আবার নরম স্থিতিস্থাপক মাটির স্পর্শ অনুভব করা, ঘাসে-ঢাকা পথ ধরে ফার্ণ-দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট স্রোতস্বিনীর তীরে গিয়ে পৌঁছানো, কলকল্লোলময় ক্ষুদ্র জলপ্রপাতের ধারায় আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকা, কিংবা হাঁচড়-পাঁচড় করে একটা পাথরের দেয়াল পার হয়ে উঁচুনীচু এবড়ো-খেবড়ো, বাঁধনহারা আনন্দোচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত প্রান্তর ভূমির মধ্যে গিয়ে পড়া ;—সে আনন্দ সত্যই বর্ণনাতীত।

ধীরে সুস্থে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়ানোর পর আমি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করি দু'জন বসবার আসনওয়ালা বাইসাইকেলে করে বোঁ বোঁ করে এক পাক্কু ঘুরে আসা। প্রবল বায়ুস্রোত মুখে এসে লাগে, নীচে "লোহার ঘোড়া" দুলতে থাকে,—মন স্ফূর্তিতে ভরে ওঠে। এমনিভাবে বাতাসের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটবার সময় আমি চমৎকার একটা শক্তি ও প্রফুল্লতার ভাব অনুভব করি। ব্যায়ামের ফলে শিরা-ধমনীতে রক্তস্রোত নাচতে থাকে, হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের সুর বেজে ওঠে।

নৌকায় চড়েই হোক, সাইকেল চড়েই হোক কিংবা পায়ে হেঁটেই হোক, বাইরে বেরুবার সময় সম্ভব হলেই আমার কুকুর আমার সঙ্গে থাকে। কুকুর আমি অনেক পুষেছি ;—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ম্যাস্‌টিফ, কোমল দৃষ্টিসম্পন্ন স্প্যানিয়েল, জঙ্গলের অন্ধি-সন্ধিজানা সেটার ও সরলহৃদয় সৌন্দর্যহীন বুল্‌-টেরিয়ার—সব রকম পুষেছি। বর্তমানে আমার হৃদয় জয় করে বসে আছে এই রকম একটি বুল্‌টেরিয়ার। তার বংশলতিকা অতি দীর্ঘ, লেজটি কোঁকড়ানো ;—আর এমন বিদঘুটে একখানা মুখ কুকুরকুলে আর কারও নেই। আমার এই সব কুকুর-বন্ধুরা আমার ইন্দ্রিয়-বৈকল্যের কথা যেন বুঝতে পারে বলে মনে হয়। আমি একলা থাকলেই তারা আমার খুব গা ঘেঁসে এসে বসে। এদের স্নেহময় আচরণ এবং লেজনাড়ার ভাষা আমার বড় ভালো লাগে।

বৃষ্টির দিন ঘরের মধ্যে আটক পড়লে অন্য মেয়েরা যেভাবে চিত্ত-বিনোদন করে থাকে আমিও তাই করি। আমি জামাকাপড় বুনতে ও ক্রুশের কাজ করতে ভালোবাসি, হয়তো বা আমার যে রকম ভালো লাগে সেই রকম ভাবে এখানে এক লাইন ওখানে এক লাইন ইচ্ছামত পড়ি, কিংবা হয়তো কোন বন্ধুর সঙ্গে দুই এক দান দাবা কিংবা সতরঞ্চ খেলি। এই সব খেলার জন্য বিশেষ ধরণে তৈরি একটি ছক আমি ব্যবহার করে

থাকি। ছকের ঘরগুলি কেটে গর্ত করে তৈরি। কাজেই ঘুঁটিগুলি বেশ শক্ত হয়ে বসে। সতরঞ্চ খেলার কালো ঘুঁটিগুলি চেপ্টা, সাদাগুলি উপরে একটু বাঁকানো। প্রত্যেকটি ঘুঁটির মাঝখান একটি করে ছিদ্র আছে, তাতে একটি পিতলের মুণ্ডি বসিয়ে দেওয়া যায়। এই উপায়ে রাজা প্রজার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়। দাবার ঘুঁটিগুলি দু'রকম আকারের হয়ে থাকে; সাদাগুলি কালোগুলির চেয়ে একটু বড় হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি চালের পর ছকের উপর হাল্কাভাবে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে আমি সহজেই বুঝতে পারি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কি অভিসন্ধি নিয়ে চাল দিচ্ছেন'। এক খোপ থেকে ঘুঁটি তুলে আর এক খোপে বসানোর সময় মৃদু ধাক্কা লাগে তা থেকে আমি বুঝতে পারি, এইবার আমার চাল দেবার সময় হয়েছে।

যদি একদম একলা পড়ে যাই আর কোন কাজ করতে ইচ্ছা না হয়, তাহলে আমি বসে বসে 'পেশেন্স্' খেলি। এই খেলা আমার খুব ভালো লাগে। আমি যে তাসগুলি ব্যবহার করি তাদের উপর দিকে ডান কোণে ব্রেইল লিপির সংকেত আঁকা থাকে। এই সংকেত থেকে আমি বুঝতে পারি কোন্‌খানি কি তাস।

আশে পাশে যদি ছোট শিশুরা থাকে, তাহলে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তাদের সংগে খুব খানিকটা হুটোপাটি করে খেলা করতে। ক্ষুদ্রতম শিশুকেও সংগী হিসাবে আমার অতি চমৎকার লাগে, আর একথা বলতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে, শিশুরাও সাধারণতঃ আমাকে বেশ পছন্দ করে। আমাকে তারা হাত ধরে ধরে নিয়ে বেড়ায়, যে সব জিনিস তাদের নিজেদের ভালো লাগে আমাকে তা দেখায়। অবশ্য ছোট ছোট শিশুরা আঙুল দিয়ে বানান করে আমাকে কিছু বোঝাতে পারে না, কিন্তু আমি তাদের ওষ্ঠ সঞ্চালন পর্যবেক্ষণ করে কাজ চালিয়ে নিতে পারি। তাও

না পারলে তারা অঙ্গ ভঙ্গি করে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। কখনও কখনও ভুল করে যা করবার নয় তাই করে বসি। শিশুহাস্যের কলধ্বনিতে নিজের ভুল সম্বন্ধে সচেতন হই। আবার ফিরে ফিরতি নির্বাক অভিনয় শুরু হয়। মাঝে মাঝে আমি তাদের গল্প বলে শোনাই, হয়তো বা নূতন কোন খেলা শেখাই। সময় যেন পাখনা মেলে উড়ে যায়; মন আনন্দ ও প্রসন্নতার আলোকে ঝলমল করতে থাকে।

নানা যাদুঘর ও শিল্পবিপণি থেকেও আমি আনন্দ ও প্রেরণা আহরণ করে থাকি। দৃষ্টিশক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র হাতের স্পর্শ দিয়েই আমি যে নিশ্চল মর্মরপ্রস্তরের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য, ভাবের আবেগ ও সৌন্দর্যের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি, এটা অনেকের কাছে অবশ্যই খুব বিস্ময়কর বলে মনে হবে। কিন্তু মহান শিল্পকৃতি সমূহ স্পর্শ করে আমি সত্যসত্যই অকৃত্রিম আনন্দ পেয়ে থাকি। আঙুলের ডগা দিয়ে খোদিত মূর্তির রেখা ও ডৌল অনুসরণ করতে করতে, শিল্পী যে সব চিন্তা ও ভাবকে রূপায়িত করে তুলেছেন, সেগুলি আমি আবিষ্কার করতে পারি। জীবন্ত কোন মানুষের মুখ আমাকে স্পর্শ করতে দিলে আমি যেমন করে তা থেকে তাঁর মনের ভাব বুঝে ফেলতে পারি, ঠিক তেমনি করেই এই সব প্রাচীন দেবদেবী ও বীরপুরুষদের মুখে ঘৃণা, সাহস ও প্রেমের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। ডায়ানা-দেবীর অঙ্গ-সংস্থানের ভঙ্গিমার মধ্যে আমি অরণ্যের মাধুর্য ও স্বাধীনতার সন্ধান পাই,—যে অদম্য সাহস পাহাড়ি সিংহকে পোষ মানায়—, উগ্রতম চিত্তবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে তার অনুভূতি লাভ করি। ভিনাসের মূর্তির বিশ্রান্তি ও সুডৌল সৌকুমার্য আমার অন্তর পুলকিত করে তোলে; বারেন্দ্র ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি অরণ্যের গভীরতম রহস্যকে আমার সামনে উদ্ঘাটিত করে দেয়।

হোমারের একখানি ফলকাকৃতি উন্নত-চিত্র আমার পড়বার ঘরের দেয়ালে

বেশ নীচুতে টাঙানো আছে। সহজেই হাত বাড়িয়ে আমি এটির নাগাল পাই, সশ্রদ্ধ ভালোবাসার সঙ্গে বিষণ্ণ-সুন্দর মুখখানির উপর হাত বুলিয়ে দেখতে পারি। সেই মহিমান্বিত ললাটের প্রতিটি রেখা আমার কত পরিচিত! —যেন জীবনেরই পথরেখা,—শত দুঃখের, শত দ্বন্দ্বের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছাপ। প্রাণহীন মৃৎ-চিত্রের মধ্যেও যেন বোঝা যায়, দৃষ্টিহীন চক্ষু দুটি আকুল আগ্রহে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গ্রীসদেশের আলোক ও সুনীল আকাশের সন্ধান করে ফিরছে;— কিন্তু বৃথা সে সন্ধান! দৃঢ়বদ্ধ, সুকুমার ও অকপট ওষ্ঠাধরের সে কি অপরূপ সৌন্দর্য! সত্য সত্যই কবির মুখ, দুঃখের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় আছে এমন একজন লোকের মুখ! তিনি যে কি ধন হারিয়েছিলেন, নিরবচ্ছিন্ন নিশীথিনীর মধ্যে কি ভাবে তাঁকে সারাজীবন বাস করতে হয়েছিল, - তা তো আমি খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারি।

অন্ধকার, অন্ধকার! মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত
ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে
অপ্রতীকার্য আঁধার-প্লাবন! আলোকের পূর্ণগ্রাস!
দিবসের আশার সমাধি!

কল্পনার কান দিয়ে আমি শুনতে পাই, হোমার গান গাচ্ছেন। কুণ্ঠিত কম্পিত পদক্ষেপে হাতড়ে হাতড়ে পথ চিনে এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে যাচ্ছেন, আর গান গাচ্ছেন,—জীবনের গান, প্রেমের গান, যুদ্ধের গান, এক মহত্তর জাতির গৌরবময় কীর্তিকলাপের গান। অপূর্ব মহিমাময় সে সঙ্গীত! তারই প্রতিদানে কবি লাভ করেছেন অমরত্বের রাজমুকুট, সর্বযুগের সর্বজনের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, ভাস্কর্যের সৌন্দর্য বোধ হয় চোখের চেয়ে হাত দিয়েই ভালো উপলব্ধি করা যায়। সরল ও বক্র রেখার এই অপূর্ব ছন্দঃপ্রবাহ স্পর্শের সাহায্যে যত সূক্ষ্মভাবে অনুভব করা যায়, আমার মনে

হয় দৃষ্টির সাহায্যে ততটা যায় না। কিন্তু, সে যাই হোক, প্রাচীন গ্রীক-জাতির-হৃৎস্পন্দন যে আমি তাদের দেবদেবীর মর্মরমূর্তি'র মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করতে পারি, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার আর একটি আনন্দ হলো থিয়েটার দেখতে যাওয়া। কিন্তু অন্যান্য আনন্দের চেয়ে এটি আমার পক্ষে দুর্লভতর। নাটক পড়ার চেয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে তার বর্ণনা শুনতে আমার অনেক বেশী ভালো লাগে। কারণ তখন আমার মনে হয় যেন উত্তেজনাময় ঘটনা প্রবাহের ঠিক মাঝখানে আমি বসে রয়েছি। জীবনে কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে স্থানকাল সব ভুলিয়ে দিতে পারেন, আবার সেই রহস্য-রোমাঞ্চময় অতীতযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের আদর্শ স্থানীয়া সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় অবতীর্ণা মিস্ এলেন টেরি-র মুখমণ্ডল ও পোষাক-পরিচ্ছদ স্পর্শ করবার সুযোগ আমি পেয়েছি। যে স্বর্গীয় মহিমা মহত্তম বেদনাকে আবৃত করে রাখে, তার প্রকাশ এঁর মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছিলাম। এঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজপরিচ্ছদে বিভূষিত স্যর হেনরি আরভিং। তাঁর চলাফেরা ও প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে ছিল প্রদীপ্ত বুদ্ধির বিভূতি; ভাব-চঞ্চল মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখায় ছিল সর্বজয়ী রাজমহিমা। যে রাজকীয় মুখভাব তিনি মুখোসের মত পরিধান করেছিলেন তার মধ্যে আমি দুঃখের যে দুর্বহ ও দুরধিগম্যতা লক্ষ্য করেছিলাম তা আমি কখনও ভুলতে পারবো না।

মিঃ জেফারসনের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে। তাঁকে আমি বন্ধুরূপে গণনা করতে পারি,—আমার পক্ষে এ একটা বড় গৌরবের কথা। তিনি যেখানে অভিনয় করছেন সেখানে উপস্থিত থাকলেই আমি তাঁর অভিনয় দেখতে যাই। যখন প্রথম তাঁর অভিনয় দেখি তখন আমি নিউ ইয়র্ক

খুলে পড়ি। তিনি সেবার রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। গল্পটি তার আগে আমি অনেকবার পড়েছি, কিন্তু রিপের আলস্য বিজড়িত, সেকেলে ধরণের সহৃদয় আচরণের মাধুর্য সেই অভিনয়ে যেমন ভাবে উপভোগ করতে পেরেছিলাম এমন আর পূর্বে কখনও পারি নি। মিঃ জেফারসনের চমৎকার সকরুণ চরিত্রানুকৃতি আমাকে আনন্দে অভিভূত করে ফেলেছিল। আমার আঙুলগুলির উপর বুড়ো রিপের যে ছবি আঁকা হয়ে আছে তা তারা কখনও ভুলতে পারবে না। অভিনয় শেষ হবার পর মিস্ সালিভান আমাকে রঙ্গমঞ্চের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁর অদ্ভুত পোষাক ও দীর্ঘ চুলদাড়িতে হাত দিয়ে দেখছিলাম। বিশ বৎসর ব্যাপী বিচিত্র নিদ্রা থেকে জেগে ওঠবার পর রিপকে কেমন দেখতে হয়েছিল তা যাতে আমি বুঝতে পারি, সেইজন্য তিনি আমাকে তাঁর মুখে হাত বুলিয়ে দেখতে দিয়েছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর রিপ্ কেমন করে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল তাও আমাকে আবার অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন।

শেরিডানের The Rivals নাটকেও আমি তাঁকে অভিনয় করতে দেখেছি। একবার বস্টনে তাঁর-বাড়ীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় তিনি আমাকে The Rivals নাটকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশগুলি অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। আমরা যে বৈঠকখানাটিতে বসেছিলাম সেইটাকেই রঙ্গমঞ্চ করে নেওয়া হলো। তিনি ও তাঁর ছেলে বড় টেবিলটার পাশে বসলেন। তারপর বব্ একার্স তার যুদ্ধাহ্বান-লিপি লিখতে শুরু করলো। আমি হাত দিয়ে তাঁদের সমস্ত অঙ্গভঙ্গি অনুধাবন করতে লাগলাম; তাঁর নানা ভুলভ্রান্তি ও হাত-পা নাড়ার মজাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করতে লাগলাম। ব্যাপারটা আমার হাতে বানান করে দিলে এসব কিছুই আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তারপর তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে

দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করলো। তরবারির ক্ষিপ্র আঘাত ও প্রতিঘাতগুলি আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। বেচারা ববের সাহসের ভাণ্ডার খালি হয়ে আসছে, সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ;—সব আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তারপর সেই সুনিপুণ অভিনেতা নিজের কোটটি ধরে একটা হেঁচ্কা টান দিলেন, মুখের পেশীগুলি একবার ঈষৎ সঙ্কুচিত করে নিলেন ; ব্যস্ ! মুহূর্ত মধ্যে আমি চলে গেলাম "ফলিং ওয়াটার্স" গ্রামে, অনুভব করলাম যেন স্নাইডার্স নামক কুকুরটি আমার হাঁটুতে তার লোমশ মাথা ঘসছে। তখন মিঃ জেফারসন "রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল্" থেকে সেই সব সর্বশ্রেষ্ঠ সংলাপ আমাকে আবৃত্তি করে শোনাতে লাগলেন যার মধ্যে মুখের হাসি ফুরোতে না ফুরোতেই চোখের জল ফুটে উঠতে থাকে। তিনি কথাগুলি বলতে লাগলেন আর আমাকে বললেন, আমার যতদূর সাধ্য কথার উপযুক্ত হাব-ভাব ও অঙ্গভঙ্গি করতে। নাটকীয় অঙ্গভঙ্গি সম্বন্ধে অবশ্য আমার কোন ধারণাই ছিল না। আন্দাজে নির্ভর করে যা তা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি অসামান্য কলানৈপুণ্য সহকারে ঠিক কথাটির সঙ্গে ঠিক অঙ্গভঙ্গি জুগিয়ে দিতে লাগলেন। "মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেলে এত শীঘ্রই কি সবাই তাকে ভুলে যায় ?"—এই কথা বলতে বলতে রিপ্ যেমন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে ; দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠে শঙ্কাকুলচিত্তে যেমন করে নিজের বন্দুক ও কুকুর খুঁজে বেড়ায় ; ডেরিকের সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই করতে গিয়ে যে রকম হাস্যকর ভাবে সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে—এসব যেন সাক্ষাৎ জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য এই হলো সেই আদর্শ জীবন, যেখানে ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি তেমনি সব ব্যাপারই ঘটে থাকে।

প্রথম বার থিয়েটারে যাওয়ার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে আজ বারো বছর হয়ে গেল। বালিকা অভিনেত্রী এল্সি লেসলি সেবার বস্টন

এসেছিল। The Prince and the Pauper নাটকে তার অভিনয় দেখবার জন্য মিস্ সালিভান আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই চমৎকার নাটকটি যখন অভিনয় হচ্ছিল তখন প্রেক্ষাগৃহে পর্যায়ক্রমে যে আনন্দ ও দুঃখের লহরী খেলে যাচ্ছিল তার কথা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। আর সেই শিশু অভিনেত্রীর বিস্ময়কর অভিনয়ের কথাও আমার চিরকাল মনে থাকবে। অভিনয়ের পর সাজঘরের মধ্যে ঢুকে তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছিল। তখনও তার পরণে সেই রাজ-পোষাক। সোনালি চুলের রাশি মেঘের মত তার দু কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে, মুখে মধুর হাসির দীপ্তি একটুও মুখচোরা ভাব নেই ; এত বড় একদল শ্রোতার সামনে এতক্ষণ ধরে অভিনয় করা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই। আমি তখন সবেমাত্র কথা বলা শিখছি ; তার নামটা যাতে বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আগে থাকতেই বার বার বলে সেটা বেশ রপ্ত করে রেখেছিলাম। যে দুই একটি কথা তাকে বললাম তা সে সহজেই বুঝতে পারলো এবং বিনা দ্বিধায় আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। আমার যে কি আনন্দ হলো তা আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন, নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আমার জীবন বহু ক্ষেত্রে বাইরের এই সুন্দরী ধরণীর সংস্পর্শে আসতে পারে। কথাটা সত্য নয় কি ? সব জিনিসের মধ্যে, এমন কি অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যেও, একটা বিস্ময়কর সৌন্দর্য নিহিত আছে। তাই আমি যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তার ভিতর থেকেই তৃপ্তিলাভ করতে পারি।

অবশ্য একথা সত্য যে, জীবনের রুদ্ধ দ্বারের সামনে একা বসে অপেক্ষা করতে করতে মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি বড় একা। একটা নিদারুণ নির্জনতার অনুভূতি হিমশীতল কুয়াশার মত আমাকে সমাচ্ছন্ন করে ফেলে।

দ্বারের ওপারে আছে আলো আর গান আর মানুষের সুমধুর সাহচর্য, কিন্তু আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। নির্বাক, নিষ্করুণ নিয়তি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে, অদৃষ্টের এই অলঙ্ঘ্য বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে, কারণ আমার হৃদয় এখনও অসংযত ও আবেগ-প্রবণ। কিন্তু যে সব নিরর্থক তিক্ত কথা আমার মুখে এসে পড়ে আমার জিহ্বা তা উচ্চারণ করতে চায় না,—চোখে শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের মত আবার তা আমার হৃদয়ের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। সমস্ত অন্তর ব্যেপে বিপুল নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। তারপর আশা এসে উঁকি মারে, মৃদু হেসে মনের কানে চুপি চুপি বলে, "নিজেকে ভুলে থাকবার মধ্যেই সত্যকার আনন্দ আছে।" তাই আমি চেষ্টা করি, অপরের চোখে দেখা আলো-কে আমার সূর্য বলে ভাবতে, অপরের কানে শোনা সুরকে আমার সঙ্গীত বলে ভাবতে, অপরের মুখের হাসিকে আমার মনের আনন্দ বলে ভাবতে।

তেইশ

জীবনে যাঁরা যাঁরা আমার আনন্দ-বিধান করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের সকলেরই নাম উল্লেখ করে যদি এই কাহিনী অলঙ্কৃত করতে পারতাম, তাহলে বড়ই ভালো হতো। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে; সে সব নাম অনেকের কাছেই অতি প্রিয়। আবার এমন অনেক নাম আছে যা আমার অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হয়তো কোনদিন এঁরা খ্যাতিলাভ করতে পারবেন না, কিন্তু যে সব মনুষ্যের জীবন এঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে

মধুর ও মহান হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যেই এঁরা অমরত্ব লাভ করতে পারবেন। জগতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মহান কাব্য পাঠের ন্যায় মনকে আনন্দ-রোমাঞ্চিত করে তোলে। এঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের দিনগুলি আমাদের জীবনপঞ্জীর "লাল তারিখ"। এঁদের করমর্দনের মধ্যে অনুকম্পা সহানুভূতির বারিধারা যেন কানায় কানায় টলমল করতে থাকে। এঁদের সুমধুর জ্ঞানসমৃদ্ধ স্বভাবের সংস্পর্শ আমাদের অধীর উদগ্র অন্তরের মধ্যে এক অপূর্ব প্রশান্তির সঞ্চার করে। এই প্রশান্তি মূলতঃ একটি ঐশ্বরিক বস্তু। যে সব সংশয়, বিরক্তি ও উদ্বেগ আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা নিশীথের দুঃস্বপ্নের মত নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। নিদ্রা-ভঙ্গের পর আমরা যেন নূতন চক্ষুকর্ণ লাভ করি; ভগবানের তৈরি পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও সঙ্গীত নূতন করে দেখতে পাই, নূতন করে শুনতে পাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যে সব গুরুগম্ভীর অথচ তুচ্ছ বস্তুতে ভরে থাকে, সেগুলি সহসা সমুজ্জ্বল সম্ভাবনার ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সব বন্ধুর সাহচর্যে আমরা যেন অনুভব করি,—দুনিয়ার সব কিছুই ভালো। হয়তো পূর্বে আমরা এঁদের কোন দিন দেখি নি, হয়তো আর কখনও জীবনের পথে এঁদের সংস্পর্শে আসবো না—কিন্তু এঁদের প্রশান্ত ও সুমিষ্ট চারিত্রিক প্রভাব যেন আমাদের অন্তরের সমস্ত অসন্তোষের উপর শান্তিবারি ছিটিয়ে দেয়। সমুদ্র যেমন অনুভব করতে পারে, পার্বত্য স্রোতস্বিনীর বারিধারা এসে তার নোনাজলকে মিঠা করে তুলছে, আমরাও তেমনিভাবে এঁদের অন্তরের আরোগ্য-স্পর্শ অনুভব করতে পারি।

অনেকে অনেকবার আমাকে প্রশ্ন করেছেন, "মানুষের সাহচর্য কি তোমাকে বিরক্ত করে তোলে না?" প্রশ্নটির তাৎপর্য আমার ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না। অবশ্য নির্বোধ ও কৌতূহলী লোকেরা যখন দেখা করতে আসে, বিশেষ

করে সংবাদ পত্রের রিপোর্টাররা যখন দেখা করতে আসে, তখন আমি সর্বদাই একটু অস্বস্তি অনুভব করে থাকি। আমি কম বুঝি মনে করে যে সব লোক আমার সঙ্গে সহজ করে কথা বলবার চেষ্টা করে তাদেরও আমি অপছন্দ করি। এ যেন আমার পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্য ইচ্ছা করে ছোট ছোট ধাপ ফেলা। উভয় ক্ষেত্রেই আচরণের অন্তর্নিহিত কপটতাটুকু সমান বিরক্তিকর।

আমার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ হয় তাঁদের হাতের নীরব স্পর্শ থেকেই তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু আমি জানতে পারি। কোন কোন হাতের স্পর্শ যেন মূর্তিমান ধৃষ্টতা। এমন অনেক লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে যাঁদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আনন্দের অস্তিত্ব নেই। এঁদের নিরুত্তাপ আঙুলগুলি হাতে ধরে আমার মনে হয়েছে যেন আমি সাক্ষাৎ ঈশান কোণের হিমঝঞ্ঝার সঙ্গে করমর্দন করছি। আবার এমন অনেকে আছেন যাঁদের হাতের মধ্যে আমি সূর্যালোকের অস্তিত্ব অনুভব করি। এঁদের করস্পর্শে আমার হৃদয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হয়তো মাত্র কোন শিশুর হাতের সসঙ্কোচ স্পর্শ! তথাপি, অন্যলোকে যেমন একটি সস্নেহ দৃষ্টিপাত থেকে আনন্দ আহরণ করে থাকে, আমার পক্ষেও তেমনি এই ধরনের করস্পর্শ সমুজ্জ্বল আনন্দ সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। আন্তরিকতাপূর্ণ করমর্দন কিংবা হৃদ্যতাপূর্ণ চিঠিপত্র থেকে আমি অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করে থাকি।

বহু দূর দূর দেশে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। বস্তুতঃ এঁদের সংখ্যা এত বেশী যে অনেক সময় আমি এঁদের সব চিঠিপত্রের জবাব দিয়ে উঠতে পারি না। এইখানে আমি বলে রাখতে চাই যে, চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার সম্বন্ধে আমার যত ত্রুটিই হোক না কেন, তাঁদের সহৃদয়তার জন্য আমি সর্বদাই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুযোগ আমার

হয়েছে। আমার জীবনের এ একটা মস্ত বড় সৌভাগ্য বলেই আমার ধারণা। যাঁরা বিশপ ব্রুক্‌স্‌কে চিনতেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন, তাঁর মত লোকের বন্ধুত্ব লাভ করা কত বড় আনন্দের ব্যাপার। শৈশবে তাঁর একখানি প্রকাণ্ড হাত নিজের ছোট্ট হাতে ধরে তাঁর কোলে বসে থাকতে আমি বড় ভালো বাসতাম। পরমেশ্বর ও আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সব সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন মিস্ সালিভান সেগুলি আমার অন্য হাতখানিতে বানান করে দিতেন। শিশুসুলভ বিস্ময় ও পুলকের সঙ্গে আমি তাঁর কথা শুনতাম। অবশ্য তাঁর মন যে উচ্চস্তরে বিচরণ করতো সে স্তরে পৌঁছুবার ক্ষমতা আমার মনের ছিল না, কিন্তু জীবনকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমি সত্যই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবার সময় প্রতিবার আমি একটা সচ্চিন্তা আহরণ করে আনতাম। তারপর আমার যত বয়স বাড়তে থাকতো, আমার মনের মধ্যে চিন্তাও তত সুন্দর হয়ে উঠতো, অর্থগৌরবে মহিমান্বিত হয়ে উঠতো। দুনিয়ায় এত রকমের ধর্ম কেন আছে,—এই প্রশ্ন নিয়ে একবার আমার বড় সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, "শোন হেলেন, সর্বমানবের জন্য একটিমাত্র ধর্ম আছে। সে হলো প্রেমের ধর্ম। পরমপিতা পরমেশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসতে শেখো; ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রতিটি জীবকে যথাসাধ্য ভালবাসো, আর মনে রেখো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অশুভ-সম্ভাবনার চেয়ে শুভ সম্ভাবনাই বেশী। এ যদি করতে পারো, স্বর্গের চাবি তোমার মুঠোর মধ্যে এসে যাবে।"—তাঁর জীবনের মধ্যেও এই মহান সত্য যথাযথভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মহিমময় হৃদয়ের মধ্যে প্রেম ও সুগভীর জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস প্রায় অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন,

যা কিছু মানুষকে মুক্ত করে, উন্নত করে;

যা কিছু নম্রতা, মাধুর্য বা সান্ত্বনা প্রদান করে ;

—সবার মধ্যেই বিরাজ করেন শ্রীভগবান।

বিশপ ব্রুক্স্ আমাকে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত বা তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা দেন নাই, কিন্তু দু'টি মহান ধারণা তিনি আমার চিত্তপটে অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। যে দু'টি হলো—পরমেশ্বরের পিতৃত্ববোধ ও বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ববোধ। তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সর্বপ্রকার ধর্ম্মমত ও পূজা-পদ্ধতির মূলে এই দু'টি সত্য বিরাজমান। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ ; তিনি আমাদের সকলের পিতা ; আমরা তাঁর সন্তান। সুতরাং দুর্দৈবের অন্ধকারতম মেঘ একদিন না একদিন অপসারিত হবেই ; ন্যায় যদিও বা পরাজিত হয়, অন্যায় কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারবে না।

এই জীবনে আমি এতই সুখে আছি যে, পরজীবনের কথা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাই না। মাত্র এই কথাটি আমি স্মরণ করে রেখেছি যে, ঈশ্বরের সেই পরম-রমণীয় অজ্ঞাত রাজ্যে আমার অনেক প্রিয় বন্ধু আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বহু বৎসর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও মনে হয় যেন তাঁরা আমার খুব কাছে কাছেই আছেন। ধরাধাম থেকে বিদায় নেবার পর পূর্বের মত হঠাৎ যদি আজ তাঁরা আমার হাত চেপে ধরেন কিংবা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কথা বলে ওঠেন, তাহলেও বোধ হয় সেটা আমার কাছে খুব বিস্ময়ের বস্তু বলে মনে হবে না।

বিশপ ব্রুকসের মৃত্যুর পর আমি বাইবেল গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছি। তা ছাড়া সোয়েডেনবর্গের 'Heaven and Hell', ড্রামণ্ডের Ascent of Man, প্রভৃতি ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কয়েকখানি দার্শনিক গ্রন্থও আমি পড়েছি। কিন্তু বিশপ ব্রুকসের প্রেমধর্মের মধ্যে আত্মার যে পরিতৃপ্তি আমি খুঁজে পেয়েছি, তেমন আর কোন মতবাদ বা সিদ্ধান্তের মধ্যে পাই নি। মিঃ হেনরী ড্রামণ্ডের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল ; তাঁর

দৃঢ়হস্তের চন্দ্রাতপূর্ণ করমর্দনের স্মৃতি আশীর্বাদের মত এখনও মনের মধ্যে জেগে আছে। এমন সহানুভূতি সম্পন্ন সঙ্গী আমি আর কখনও পাই নি। তিনি এত খবর রাখতেন এবং তাঁর স্বভাবটি এত সুমিষ্ট ছিল যে, তাঁর সাহচর্য লাভ করলে কারও পক্ষে নিরানন্দ থাকা অসম্ভব ছিল।

ডাঃ অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। একদিন রবিবার অপরাহ্নে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবার জন্য আমাকে ও মিস্ সালিভানকে তিনি নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। সেটা বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভকাল। আমি সবে তখন কথা বলতে শিখেছি। আমাদের অবিলম্বে তাঁর লাইব্রেরী কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। দেখলাম একখানা বড় হাতলওয়ালা চেয়ারে তিনি বসে আছেন। পাশেই চুল্লীতে খোলা অগ্নিকুণ্ড গন্ গন্ করে জ্বলছে। আমাদের দেখে বললেন যে, তিনি অতীত দিনের কথা চিন্তা করছেন।

আমি বললাম, "আর বোধ হয় মনে মনে চার্লস্ নদীর জলকল্লোল শুনছেন।"

তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, সত্যই চার্লস্ নদীর স্মৃতির সঙ্গে আমার অনেক সুখস্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে।"—ছাপা কাগজ আর বাঁধাই-এর চামড়ার গন্ধ থেকে বুঝতে পারলাম, কক্ষটি পুস্তকে বোঝাই। অভ্যাস-বশতঃ বই-এর সন্ধানে হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাতের আঙুল গিয়ে পড়লো টেনিসনের একখণ্ড চমৎকার বাঁধাই-করা কাব্যগ্রন্থাবলীর উপর। মিস্ সালিভান বইখানির নাম বলে দেবার পর আমি আবৃত্তি করতে শুরু করলাম,—

শীতল ধূসর উপলরাশির পর
ভেঙে ভেঙে পড় অবিরাম, হে সাগর!

কিন্তু সহসা আমি থেমে গেলাম। হাতের উপর অশ্রুর স্পর্শ অনুভব

করলাম। আমার প্রিয় কবির চোখে আমি জল এনে ফেলেছি। বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে তাঁর চেয়ারে টেনে বসালেন; নানা বিচিত্র জিনিস এনে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে দিলেন। তাঁর অনুরোধে The Chambered Nautilus কবিতাটি তাঁকে আবৃত্তি করে শোনালাম। তখন এইটিই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় কবিতা। এর পর বহুবার ডাঃ হোমসের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। শুধু কবিকে নয়, ভিতরকার মানুষটিকেও আমি ভালোবাসতে শিখেছিলাম।

ডাঃ হোমসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অল্প কিছুদিন পরে গ্রীষ্মকালের এক রমণীয় দিনে মেরিম্যাক নদীর তীরে অবস্থিত হুইটিয়ারের শান্ত আবাস-ভবনে গিয়ে আমি ও মিস্ সালিভান তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলাম। তাঁর বিনম্র ভদ্রতা ও সেকেলে ধরণের কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। উঁচু অক্ষরে ছাপা স্বরচিত কবিতার একখানি বই তাঁর কাছে ছিল। তা থেকে In School Days কবিতাটি আমি তাঁকে পড়ে শোনালাম। আমি এত পরিষ্কার ভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতে পারি দেখে তিনি খুব খুসি হলেন। বললেন, আমার কথা বুঝতে তাঁর একটুও কষ্ট হচ্ছে না। তারপর কবিতাটি সম্বন্ধে আমি তাঁকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম এবং তাঁর ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে উত্তরগুলি বুঝে নিতে লাগলাম। তিনি বললেন, কবিতায় উল্লিখিত ছোট ছেলেটি তিনি নিজে, আর মেয়েটির নাম ছিল স্যালি। Laus Deo নামক কবিতাটিও আমি তাঁকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলাম। শেষ স্তবকটি যখন আবৃত্তি করছি, তখন তিনি আমার হাতে একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করলেন। প্রতিমূর্তিটি এক ক্রীতদাসের। সে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে, আর তার অঙ্গ থেকে বন্ধন-শৃঙ্খল খসে পড়ছে। দেবদূত যখন পিটারকে কারাকক্ষ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন তাঁর অঙ্গ থেকেও এমনিভাবে শৃঙ্খল খসে

পড়েছিল। তারপর আমাদের তিনি তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে গেলেন, আমার শিক্ষয়িত্রীর খাতায় স্বহস্তলিপি লিখে দিলেন, * এবং তিনি যা করেছেন তার জন্য তাঁকে সাধুবাদ প্রদান করলেন। আমাকে বললেন, "তোমার শিক্ষয়িত্রীই তোমার আধ্যাত্মিক মুক্তিদাত্রী।" তারপর আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাড়ীর সদর দরজা পর্যন্ত এলেন এবং সস্নেহে আমার ললাট-চুম্বন করলেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, আগামী গ্রীষ্মাবকাশে আবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো, কিন্তু কথা রাখবার পূর্বেই তিনি মারা যান।

ডাঃ এড্ওয়ার্ড এভারেট হেল আমার একজন অতি পুরাতন বন্ধু। আমার যখন আট বছর বয়স তখন থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর যতই বয়স বেড়েছে তাঁর প্রতি ভালবাসাও আমার ততই বেড়েছে। জীবনে যখনই দুঃখকষ্টে পড়েছি তখনই তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও সস্নেহ সহানুভূতি আমার ও মিস্ সালিভানের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করেছে; জীবনের বন্ধুর পথে তাঁর সবল হস্ত বার বার আমাদের সাহায্য করেছে। আর আমাদের জন্য তিনি যতটা করেছেন, কঠিন কর্তব্য সম্পাদনে রত অন্য সহস্র লোকের জন্যও ঠিক ততটাই করেছেন। ধর্মনীতির পুরাতন পাত্র তিনি প্রেমের নূতন মদিরা দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। কেমন করে বিশ্বাস করতে হয়, কেমন করে বাঁচতে হয়, কেমন করে চিত্তের স্বাধীনতা বজায় রাখতে হয়—তার দৃষ্টান্ত তিনি সবার সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা তাঁর নিজের জীবনে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হতে আমরা দেখেছি,—দেশপ্রেমের শিক্ষা, হীনতম মানুষের প্রতি সহৃদয়তার শিক্ষা, উন্নত ও প্রগতিশীল জীবনযাপনের

* "আপনার প্রিয়তমা ছাত্রীর মনের বন্ধন মোচন করে আপনি যে মহৎ কর্ম সাধন করেছেন তার জন্য আমার প্রশংসা ও সাধুবাদ গ্রহণ করুন,—ইতি আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু, জন জি. হুইটিয়ার।"

আকাঙ্ক্ষার শিক্ষা। তিনি ধর্মোপদেষ্টা,—বহু মানবকে তিনি সৎপ্রেরণা দান করেছেন। ভগবদ্বাক্যকে তিনি অকুতোভয় কর্মে পরিণত করেছেন। তিনি সর্বমানবের বন্ধু। পরমেশ্বর তাঁকে সুখী করুন!

ডাঃ আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল্-এর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তারপর, কখনও বা ওয়াশিংটনে কখনও বা কেপ ব্রিটন দ্বীপের অভ্যন্তরে ব্যাডেক গ্রামের সন্নিকটবর্তী তাঁর রমণীয় বাসভবনে, তাঁর সাহচর্যে আমি বহুদিন পরমানন্দে কাটিয়েছি। চার্লস্ ডাড্‌লি ওয়ার্নার তাঁর বইএ এই ব্যাডেক গ্রামটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। এইখানে ডাঃ বেল্-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কিংবা বিরাট ব্রা দর উপসাগরের তীরবর্তী মাঠে ময়দানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আনন্দে কাটিয়ে দিয়েছি। কখনও বা তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য সম্বন্ধে কথা বলেছেন, আমি শুনেছি; কখনও বা তিনি ঘুড়ি উড়িয়েছেন, আমি তাঁকে সাহায্য করেছি। ভবিষ্যৎ বিমানপোতসমূহ যে সব প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে সেগুলি তিনি এমনিভাবে ঘুড়ি উড়িয়েই আবিষ্কার করবার আশা রাখেন। ডাঃ বেল্ বিজ্ঞানের বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছেন। যে কোন বিষয় নিয়ে, এমন কি বিজ্ঞানের জটিলতম সিদ্ধান্তগুলি নিয়েও, অতি চিত্তাকর্ষকভাবে আলোচনা করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তাছাড়া, তাঁর সান্নিধ্যে এলে তোমারও মনে হবে যে, হাতে যদি একটু বেশী সময় থাকতো তাহলে বোধ হয় তুমিও নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে ফেলতে পারতে। তাঁর চরিত্রের মধ্যে রসপ্রবণতা এবং কবিজনোচিত কল্পনা-প্রবণতারও একটা দিক আছে। শিশুদের প্রতি ভালোবাসাই হলো তাঁর সবচেয়ে প্রবল চিত্তবৃত্তি। ছোট একটি বধির শিশুকে কোলে নিয়ে বসে থাকতে তিনি যত আনন্দ পান এমন বোধ হয় আর কিছুতেই পান না। বধির ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা

চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পুরুষ-পুরুষানুক্রমে যে সব বধির শিশু ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে তাদের উপরেও তা ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত বর্ষিত হবে। তিনি নিজে যা করেছেন তার জন্য আমরা তাঁকে যতখানি ভালোবাসি, নিজের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে পরকে দিয়ে যা করিয়ে নিয়েছেন তার জন্যও ঠিক ততখানিই ভালোবাসি।

যে দুই বছর আমি নিউ ইয়র্কে কাটিয়েছিলাম সেই সময় বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এঁদের নাম অবশ্য পূর্বে আমি বহুবার শুনেছিলাম, কিন্তু এঁদের সঙ্গে দেখাশুনা হবে এমন আশা আমি কখনও করি নি। আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ লরেন্স হাটনের গৃহে এঁদের অধিকাংশের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মিঃ হাটনের রমণীয় আবাস-ভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ও তাঁর মধুরস্বভাবা পত্নীর সঙ্গে দেখা করা, তাঁদের লাইব্রেরী পরিদর্শন করা, এবং তাঁদের নানা জ্ঞানী ও গুণী বন্ধুদের দ্বারা লিখিত ভাবগর্ভ ও চিন্তাশীল রচনাদি পাঠ করা—এ আমার কাছে বিশেষ একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হতো। যাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তির মনে মহত্তম চিন্তা ও সহৃদয়তম ভাব উদ্রেক করবার ক্ষমতা মিঃ হাটনের আছে,—তারা সত্য কথাই বলেন। তাঁর চরিত্র বুঝবার জন্য A Boy I Knew পড়বার কোন প্রয়োজন নেই। সত্যই এমন উদারহৃদয় মধুর স্বভাব বালক আমি আর কখনও দেখিনি। সুখে দুঃখে তাঁর বন্ধুত্বের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। মানুষের জীবনের ইতিহাসেই হোক আর কুকুরের জীবনের ইতিহাসেই হোক সর্বত্রই সমভাবে তিনি প্রেমের পদচিহ্নের সন্ধান করতে পারেন।

মিসেস্ হাটন্ আমার অতি বিশ্বস্ত বান্ধবী;—তাঁর বন্ধুত্ব বার বার যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। জীবনে যা আমি সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করি তার অনেক কিছুর জন্যই আমি তাঁর কাছে ঋণী।

কলেজে অধ্যয়ন কালে তাঁর কাছ থেকেই আমি সবচেয়ে বেশী উপদেশ ও সাহায্য লাভ করেছি। আমার কাজ যখন আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন ও নিরুৎসাহকর বলে মনে হয়, তখন তাঁর লেখা চিঠিগুলি থেকে আমি মনের খুশি ও বুকের ভরসা দুইই আহরণ করে থাকি। একটি কষ্টসাধ্য কর্তব্য সম্পাদন করতে পারলে পরবর্তী কর্তব্যটি অনেক বেশী সরল ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে,—এই শিক্ষা আমরা যাঁদের কাছ থেকে পেয়ে থাকি তিনি তাঁদেরই একজন।

মিঃ হাটন্ তাঁর বহু সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মিঃ উইলিয়ম ডীন হাওয়েল্‌স্ ও মার্ক্ টোয়েন। এ ছাড়া মিঃ রিচার্ড উইল্‌সন গিল্‌ডার ও মিঃ এড্‌মণ্ড ক্ল্যারেন্স স্টেড্‌ম্যানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। মিঃ চার্লস্ ডাড্‌লি ওয়ার্ণারের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। আমার এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটি চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। ইনি উদার সহানুভূতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে সত্যই বলা যেত যে, ইনি এঁর সকল প্রতিবেশীকে, এমন কি সমস্ত প্রাণীকে, আত্মবৎ জ্ঞানে ভালোবাসতেন। একবার মিঃ ওয়ার্ণার আমার একজন অতি প্রিয় কবিকে, অরণ্যপ্রকৃতিরকবি মিঃ জন বারোজকে, আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এঁদের সকলেরই আচরণ ভদ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। এঁদের রচিত প্রবন্ধ ও কাব্য পাঠ করে আমি যতখানি চমৎকৃত হয়েছিলাম এঁদের চালচলনের মাধুর্যও আমাকে ঠিক ততখানি চমৎকৃত করেছিল। এঁরা সবাই ছিলেন সাহিত্যিক। কথাবার্তার সময় যেভাবে এঁরা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ করতেন এবং গভীর বাদানুবাদ শুরু করে দিতেন, আলাপ আলোচনার মধ্যে যে ভাবে বুদ্ধিদীপ্ত সুভাষিতাবলী ও সময়োপযোগী রঙ্গরসের অবতারণা করতেন, তাতে আমার পক্ষে তাঁদের সঙ্গে তাল দিয়ে

চলা সম্ভব হতো না। ভবিষ্যতের গৌরবময় সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর ইনিয়াসের ন্যায় তাঁরা বীরোচিত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতেন, আর আমি শিশু আস্কানিয়াসের মত টলতে টলতে ছুটতে ছুটতে কোনমতে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতাম। কিন্তু তাঁরা অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতেন। মিঃ গিলডার কেমন করে রাত্রিকালে চাঁদের আলোয় বিরাট মরুভূমি অতিক্রম করে মিশরের পিরামিড দেখতে গিয়েছিলেন তা আমাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছিলেন। আর একবার আমাকে একখানা চিঠি লিখে নিজের স্বাক্ষরের নীচে ইনি এমন গভীরভাবে একটা ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন যাতে আমি সহজেই হাত দিয়ে সেটি অনুভব করতে পারি। এই কথায় মনে পড়লো, ডাঃ হেল আমাকে যেসব চিঠি লিখতেন তাতে বরাবর ব্রেইল পদ্ধতিতে ফুটকি ফুটিয়ে ফুটিয়ে নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন। এইভাবে তিনি আমার সঙ্গে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা স্থাপন করবার চেষ্টা করতেন। মার্ক টোয়েনের নিজ মুখে বলা কয়েকটি ভালো ভালো গল্প আমি তাঁর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শুনেছি। চিন্তা করার, কথা বলার ও প্রত্যেকটি কাজ করার তাঁর একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেই আমি যেন তাঁর চক্ষুর কৌতুকদৃষ্টি অনুভব করতে পারি। অদ্ভুত রকমের মজাদার সুর করে তিনি যখন তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করতে থাকেন তখনও কিন্তু একথাটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানুষটির হৃদয় যেন সর্বমানবের প্রতি সহানুভূতির রসে অভিষিক্ত স্নেহকোমল একখানি মহাকাব্য। সেখানে তিক্ততার লেশমাত্র নেই।

নিউ ইয়র্কে আরও বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ছিলেন St. Nicholas পত্রিকার জনপ্রিয় সম্পাদিকা মিসেস্ মেরি মেপ্‌ল্‌স্ ডজ্ ও সুমধুর "Patsy" চরিত্রের সৃষ্টিকর্ত্রী মিসেস

রিগস্ (কেট ডগ্লাস উইগিন)। এঁদের কাছ থেকে আমি যে সব উপহার পেয়েছি তার মধ্যে তাঁদের হৃদয়ের সস্নেহ অনুমোদনের স্পর্শ লাভ করেছি,—তাঁদের নিজস্ব চিন্তারাজিতে পরিপূর্ণ বই, কিংবা অন্তরের গোপন আলোকে আলোকিত চিঠিপত্র, কিংবা হয়তো এমন সব ফটোগ্রাফ যার বর্ণনা বার বার শুনেও আমার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধবের নামোল্লেখ করবার স্থান এখানে নেই। তাছাড়া তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যার উপর একটা সুপবিত্র গোপনতার আচ্ছাদন থাকাই উচিত। ছাপার অক্ষরে সে সব কথা প্রকাশ করা চলে না। মিসেস্ লরেন্স হাটনের নামোল্লেখ করবার আগেও আমি অনেক ইতস্ততঃ করেছি।

আর মাত্র দু'জন বন্ধুর কথা আমি বলবো। একজন হলেন পিট্স্-বার্গের মিসেস্ উইলিয়াম থ'। লিণ্ডহার্স্ট নামক এঁর আবাসভবনে আমি অনেকবার গিয়ে বাস করে এসেছি। ইনি সব সময়েই এমন কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন যার উদ্দেশ্য হলো অপর কাউকে সুখী করা। দীর্ঘদিন ধরে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। প্রয়োজনের সময় আমি ও আমার শিক্ষয়িত্রী এঁর সহৃদয়তাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ থেকে কখনও বঞ্চিত হইনি।

অপর বন্ধুটির কাছেও আমি গভীর ঋণে আবদ্ধ। ইনি সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। বহু বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান ইনি সুদৃঢ় হস্তে পরিচালনা করে থাকেন। বিস্ময়কর কর্মক্ষমতার দ্বারা ইনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সকলেরই প্রতি ইনি সমান সদয় ব্যবহার করে থাকেন; নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে অপরের মঙ্গল সাধন করে বেড়ান। কিন্তু ইনি সেই সম্মানিত বন্ধুগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত যাঁদের নামোল্লেখ করা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তথাপি তাঁর উদারতা ও আমার প্রতি সস্নেহ অনুরাগের কথা

আমাকে বলতেই হবে। তাঁর সাহায্য না পেলে আমার কলেজে পড়া সম্ভব হতো না।

কাজেই একথা আমি অনায়াসেই বলতে পারি যে, আমার বন্ধুরাই আমার জীবন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। তাঁদের সহস্র চেষ্টার ফলেই আমার জীবনের বাধাবিঘ্ন কেটে গিয়ে নানা অপরূপ সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। জীবন আমাকে নানাভাবে বঞ্চিত করেছে। তথাপি সেই বঞ্চনার অন্ধকারের মধ্য দিয়েও যে আমি প্রশান্ত ও সানন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারছি,—সে শুধু তাঁদেরই অনুগ্রহে।

শেষ